জুলাই ২০২৪ ■ আষাঢ় - শ্রাবণ ১৪৩১

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

সুহেইর আরাফী, দশম শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

তামাজুর জামান গল্প, কেজি শ্রেণি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বুয়েট ক্যাম্পাস, ঢাকা

সম্পাদকীয়

কেমন আছো বন্ধুরা? বর্ষার এই সময় নিশ্চয়ই ঘরে বসে দারুণ সময় কাটাচ্ছ। ষড়ঋতুর এই দেশে গ্রীষ্মের পরই বর্ষা আসে থইথই জল-জোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে। মাঠে-ঘাটে, খালে-বিলে সবখানেই জলেরই উল্লাস, জলেরই খেলা।

আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। আষাঢ় মাসে মেঘ কালো করে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি ছাড়া বর্ষা যেন অসম্পূর্ণ এক ঋতু। বর্ষায় মেঘ আর বৃষ্টির ছোঁয়ায় হৃদয় স্মৃতিকাতর হয়, মন হয় উদাস ব্যাকুল। বর্ষা কবির কলমে কবিতা হয়, লেখকের গল্প হয়, আবার গায়কের কণ্ঠে গান হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনেক লেখনীতে বর্ষার গুণগান করেছেন। কবিরা বর্ষাকে নিয়ে লিখেছেন অসংখ্য কবিতা, গান, গীতি আলেখ্য। তাই তো বসন্ত ঋতুরাজ হলেও বর্ষাকে মনে করা হয় ভালোবাসার সমার্থক ও ঋতুর রানি হিসেবে।

প্রিয় ঋতু বর্ষায় রোদ, বৃষ্টি, মেঘের অদ্ভুত খেলা প্রকৃতিকে ধুয়ে মুছে সবুজ করে তোলে। সকল জরা-জীর্ণ গ্লানি দূর করে ধরণীকে শুদ্ধ করে। এসময় টানা বর্ষণে মাটি উর্বর হয়, রস পায়। হরেক রকম ফল হয়। বাহারি ফুলের ঘ্রাণে চারপাশ ভরে উঠে। বৃষ্টিভেজা কদমের মনকাড়া সৌরভে প্রাণ ফিরে পায় প্রকৃতি।

বন্ধুরা, বর্ষাকালের এই সময়টিতে ডেঙ্গু ও অন্যান্য রোগের প্রকোপ খুব বেড়ে যায়। তোমরা এসময় খুব সাবধানে থাকবে। ভালো থেকো বন্ধুরা।তোমাদের জন্য শুভকামনা।

প্রধান সম্পাদক
আকতার হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
কাজী শাম্মীনাজ আলম

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

সূচি

নিবন্ধ

০৪ বাংলা কবিতায় বর্ষাবন্দনা/ এস ডি সুব্রত
৩২ বর্ষার মোহনীয় রূপ/ শাহানা আফরোজ
৩৪ বর্ষার ফুলের হাসি/ শাহানাজ সুলতানা
৪৪ গাছ যেভাবে বৃষ্টি আনে/ মেজবাউল হক
৫৪ মেঘের অনেক নাম/সানোয়ার সাকিব
৫৬ রংধনুর রঙের খেলা/ ইসমত আরা
৬২ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

ভ্রমণ কাহিনি

২৯ পাহাড়ের রানি দার্জিলিং/ ডালিয়া ইয়াসমিন

গল্প

০৮ হালুমের গায়ে হলুদ/ খায়রুল বাবুই
১৩ রাসেল ভাইপার/ আশরাফ পিন্টু
১৭ ব্যাঙের শহর দেখা/ হুমায়ূন কবীর ঢালী
২৫ আরেক জন পিপলু/ তারিক মনজুর
৩৬ বৃষ্টিফোঁটা নামবে নিচে/ শাকিব হুসাইন
৩৮ তেঁতুল গাছে ভূত/ নুরুল ইসলাম বাবুল
৪৯ প্রথম বন্ধুত্ব/ আলমগীর কবির
৫১ অদল বদল/ অনিরুদ্ধ কবীর অন্বয়

সাফল্য প্রতিবেদন

১৬ সাপে কামড়ালে প্রাথমিক চিকিৎসা/ মো. জামাল উদ্দিন
৫৮ আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের দুই পদক/ তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
৫৯ নারী হকির 'নাম্বার ১০'/ জান্নাতে রোজী
৬০ দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

কবিতাগুচ্ছ

০৩ আষাঢ়/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
০৭ শারমিন নাহার ঝর্ণা/ এইচ এস সরোয়ারদী
১২ কাজল নিশি/ মামুন সরকার
১৫ মনির জামান/ আনোয়ারুল হক নূরী
২৪ মাহফুজ রুমান খান/ সরোয়ার রানা
২৮ মমতা মজুমদার/ সাঈদুর রহমান লিটন

ছোটোদের ছড়া

৩২ রাফিয়া আদনীন/মারুফ বিল্লাহ
৪২ টুম্পা ইসলাম/ সুমাইয়া জান্নাত/ নেহা ইসলাম
৪৩ মো. মুশফিকুর রহমান

ছোটোদের লেখা

৪৩ আমার গল্প/ আরাফ আজিজ
৪৫ ভিন্ন জগতে/ রহমাতুল্লাহ আল আরাবী

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : সুহেইর আরাফী/তামাজুর জামান গল্প
তৃতীয় প্রচ্ছদ : আয়ান হক ভূঁইয়া/রামিসা রহমান
৪১ সিরাজুম মুনিরা বিভা
৫০ মাহমুদুল হাসান হিমেল
৬৩ মৃন্ময়ী দে
৬৪ মাহিম সরকার/নাফিসা তাবাসসুম তাজ

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (*Nobarun Potrika*) আপলোড পত্রিকা পড়া যাবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট *www.dfp.gov.bd*- এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

আষাঢ়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউশের ক্ষেত জলে ভরভর,
কালি-মাখা মেঘে ও পারে আঁধার ঘনিছে দেখ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।।

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন, ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি,
রাখালবালক কী জানি কোথায় সারা দিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।।

শোনো শোনো ওই পারে যাবে বলে কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর বেগে জলে পড়ি জল ছলছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।।

ওগো, আজ তোরা যাস নে গো, তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর নাহি রে।
ঝরঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন পথপাশে দেখ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।।

বাংলা কবিতায় বর্ষাবন্দনা

এস ডি সুব্রত

বাঙালি কবি ও লেখকদের বর্ষা যতটা আলোড়িত করে অন্য কোনো ঋতু ততটা পারে না। কবি , লেখক এমনকি সাধারণ মানুষের অন্তরে বর্ষার আবেদন একটু অন্য রকমের। বর্ষার ঝরঝর বারিধারা আমাদের হৃদয়কে আনন্দে

ও বিরহে সিক্ত করে তুলে। শুধু কালিদাস, জয়দেব, বৈষ্ণব কবি কিংবা রবীন্দ্রনাথ নন, যুগে যুগে অনেক কবি-সাহিত্যিকদের হৃদয়ানুভূতিকে বর্ষা প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। আমাদের শিল্প , সাহিত্য ও সংগীতে বর্ষা আসে অপরূপ রূপে। বর্ষার প্রকৃতি যেন এক প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে আসে। কালো মেঘ,অঝোর বৃষ্টি যেন বর্ষার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। বর্ষার নতুন পানির ছোঁয়ায় প্রকৃতি সেজে উঠে নতুন রূপে, সবুজে সবুজে। গ্রীষ্মের প্রখর রোদে যখন বাংলার মাঠঘাট বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে ,তখন বর্ষার জলধারায় ভেসে আসে সোঁদা মাটির গন্ধ। বাংলা কবিতায় বর্ষাকে নানাভাবে উপস্থাপন করেছেন মধ্যযুগের এবং আধুনিক যুগের কবিরা। বর্ষা নিয়ে ছোটোবড়ো প্রায় সব কবির রয়েছে কোনো না কোনো কবিতা কিংবা ছড়া।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতায় বর্ষায় প্রকৃতি ও মানুষ মিলেমিশে একাকার। তিনি তাঁর বর্ষা কবিতায় প্রকৃতি ও মানুষের বন্ধন খুঁজেছেন এভাবে-

'গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর / উথলিল নদনদী ধরণী উপর।

রমনী রমণ লয়ে, /সুখে কেলি করে, দানবাদি দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত 'সোনার তরী' কবিতায় বর্ষার মনোরম চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কলমের আঁচরে।

'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান - কাটা হল সারা,...

কবিগুরু তাঁর আষাঢ় কবিতায় বর্ষা আর বৃষ্টির অনন্য চিত্র তুলে ধরেছেন।

'নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউশের ক্ষেত জলে ভরভর,...

কবি নূরুল হুদা 'বৃষ্টি পড়ে' কবিতায় বৃষ্টিকে প্রকাশ করেছেন ভিন্ন মাত্রায়।

বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে / মনে মনে বৃষ্টি পড়ে
বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে/ বনে বনে বৃষ্টি পড়ে
মনের ঘরে চরের বনে/ নিখিল নিঝুম গাঁও গেরামে
বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে/ বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে।

শামসুর রাহমান 'অনাবৃষ্টি' কবিতায় লিখেছেন.....

'টেবিলে রয়েছি ঝুঁকে, আমিও চাষীর মতো বড়
ব্যাগ্র হয়ে চেয়ে আছি, খাতায় পাতায়
যদি জড়ো হয় মেঘ, যদি ঝরে ফুল্লবৃষ্টি
অলস পেনসিল হাতে বকমার্কা
পাতা-জোড়া আকাশের খাঁ খাঁ নীল।'

বর্ষা ও মেঘে আচ্ছন্ন হয়নি এমন কবি বাংলা ভাষায় খুঁজে পাওয়া ভার। বর্ষায় মেঘেরা যখন দলবেধে উড়ে যায় তখন কবি-লেখকদের সাথে সাথে সাধারণ মানুষের মনও উড়ে যায় মেঘের দেশে।

একজন বিরহকাতর মানুষের মাঝে বর্ষার বৃষ্টি বিরহের বার্তা নিয়ে আসে। মানুষের মনের সমস্ত দুঃখ-সুখ, আনন্দ-বেদনা মূর্ত হয়ে উঠে বর্ষার ঝরঝর বারিধারায় প্রবলভাবে। ❐

কবি ও প্রাবন্ধিক

কবিতা

আষাঢ় এল

শারমিন নাহার ঝর্ণা

আষাঢ় এল রিমিঝিমি বৃষ্টি নিয়ে
সাজল পাতা জলের ফোঁটা দিয়ে,
মেঘবালিকা উড়ে যায় ভিনদেশে
হঠাৎ সূর্যমামা উঁকি দেয় মুচকি হেসে।

ব্যাঙেরা সব ডাকছে একসাথে মিলে
টিপটিপ বৃষ্টি ঝরছে ওই দেখো বিলে,
বৃষ্টি পেয়ে বৃক্ষলতা পায় যে পরম সুখ
গাছের ডালে পাখির বাসায় নামে দুখ।

টিনের চালে বৃষ্টি পড়ে অঝোর ধারায়
বৃষ্টির ছন্দে মনটা সুখে হারায়,
নতুন সতেজ রূপ নিয়ে প্রকৃতি সাজে
আষাঢ় এল সূর্যমামা লুকায় লাজে।

বর্ষা

এইচ এস সরোয়ারদী

বর্ষা আমার অনেক প্রিয়
বর্ষা আমার সই
বর্ষা এলে কী খুশিতে
মন করে থই থই।

বর্ষা আমার মনের রানি
বর্ষা আমার আসমানি
বর্ষা মিষ্টি খুব,
অবাক হয়ে দু'চোখ ভরে
দেখি তাহার রূপ।

গল্প

হালুমের গায়ে হলুদ

খায়রুল বাবুই

অ্যাই লম্বু, গলাটা একটু ডানে সরাও, আমার দেখতে অসুবিধা হচ্ছে।

কথাটা যে তাকেই উদ্দেশ্য করে বলা, বুঝেও চুপ করে থাকল জিরাফ। সবার কথায় নাক গলাতে নেই। এমনিতেই তার গলা বেশ লম্বা! এ নিয়ে প্রায়ই নানাজনের খোঁচা কথা হজম করতে হয়।

পাত্তা না পেয়ে বেশ অপমানিত বোধ করল বানর। লাফ দিয়ে কাছাকাছি অন্য একটা ডালে গেল। হালকা ধমক দিয়ে বলল, 'কী মিস্টার জিরাফ, কথা কানে যায় না? গলাটা ডানে সরাতে বললাম, শুনলেই না। আমাকে কষ্ট করে অন্য ডালে এসে বসতে হলো।'

'এ জন্যই তোমাকে সবাই বানর নয়, বান্দর বলে ডাকে।' জিরাফ উপরে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'তুমি কাজের চাইতে কথা বেশি বলো।'

এমন মোক্ষম প্রতিউত্তর আশা করেনি বানর। তাই কথা বাড়ালো না। কারণ এখানে বনের অনেক পশুপাখি এসেছে। উল্টাপাল্টা কিছু করলে হালুমের ধমক খেতে হতে পারে।

বনের এ পাশটা তেমন ঘন নয়। গাছপালা একটু কমই। শতবর্ষী বটগাছটার নিচে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানেই জমায়েত হয়েছে সবাই। উদ্দেশ্য সরাসরি হালুম মানে বাঘের ছবি আঁকা দেখবে।

বাঘের দাওয়াত বলে কথা। কেউ অগ্রাহ্য করতে পারেনি। বনের রাজা সিংহ এসেছে। চতুর শেয়াল এসেছে। গান গাইতে গাইতে কোকিল এসেছে। বিড়বিড় করতে করতে ময়না এসেছে। হাতি এসেছে হেলেদুলে। সাবধানে সজারু এসেছে। ইঁদুর এসেছে দলবেধে। ছাগলের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সবার শেষে এসেছে গরু।

বটগাছটার সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা বিশাল একটা ক্যানভাস। ধবধবে সাদা।

হালুম দাঁড়িয়ে আছে সেটার সামনে। তার চারপাশে নানা রঙের কৌটা আর ছবি আঁকার অন্যান্য সরঞ্জাম। হালুমকে এটা-সেটা এগিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করছে জিরাফ। হঠাৎ খেয়াল হলো, হলুদ রঙের কৌটাটা নেই। গলা বাড়িয়ে এদিক সেদিক খুঁজতে লাগল জিরাফ। পেল না। এখন কী হবে? হালুম জানতে পারলে তো ক্ষেপে যাবে।

‘কী হলো জিরাফ? কোনো সমস্যা?’ বাঘ জানতে চাইল।

‘ইয়ে মানে, হলুদ রঙের কৌটাটা দেখছি না কোথাও।’ মিনমিন করে বলল জিরাফ।

‘এটা দেখছি আসলেই সমস্যা।’ বাঘ চিন্তায় পড়ে গেল, ‘ভালো করে খুঁজে দেখো তো।’

জিরাফ বলল, ‘দেখেছি। নেই।’

‘বলো কী!’ ধমকে উঠল বাঘ, ‘কার দায়িত্ব ছিল কৌটাগুলো আনার?’

উপরের দিকে তাকিয়ে ইশারায় বানরকে দেখালো জিরাফ। বানর সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘ইয়ে হালুম বস, সবই তো এনেছি। হলুদ রঙের কৌটাটা কীভাবে যে মিসিং হলো।’

বাঘ কিছু না বলে কটমট করে তাকিয়ে থাকল।

বানর ভয়ে ভয়ে বলল, ‘আমি এখনই যাচ্ছি হলুদ রং আনতে। লাফিয়ে লাফিয়ে যাব আর দৌড়ে দৌড়ে চলে আসব, আপনার ভাষণ শেষ হওয়ার আগেই।’

বলেই লাফিয়ে পাশের ডালে চলে গেল বানর। সেখান থেকে আরেকটা গাছের ডালে। এরপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

সামনে থাকা সমবেত প্রাণীদের দিকে দৃষ্টি ফেরালো বাঘ। হাসি হাসি চেহারায় বলল, ‘সবাইকে ধন্যবাদ আমার আমন্ত্রণে এখানে আসার জন্য। আমি একটু বিব্রত, কারণ বনের রাজা সিংহও এসেছেন আমার ছবি আঁকা দেখতে। তবে’...

‘এর মধ্যে আবার তবে-টবে কী হালুম সাহেব?’ সিংহ ভ্রু কুঁচকে জানতে চায়।

‘না মানে,’ বাঘ অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলল, ‘তবে যারা এখানে না এসে বাসায় অলস শুয়ে-বসে কিংবা আড্ডা মেরে সময় কাটাচ্ছে, তাদের কথা আমার মনে থাকবে।’

‘তার মানে আমাদেরকে ভুলে যাবেন?’ ফট করে বলে বসল ছাগল।

‘অ্যাই চুপ, সবসময় বেশি কথা বলিস।’ পাশ থেকে নিচু গলায় ধমক দিল গরু।

ছাগলের দিকে একপলক তাকিয়ে বাঘ বলল, ‘নাহ্, সবাইকে ভুললেও তোমাকে ভুলব না।’

সিংহ বলল, ‘বাদ দাও হালুম। ছাগল তো, কোন জায়গায় কী বলতে হবে, সেটা বোঝেনি। তা তুমি যেন কী বলছিলে?’

ছাগলের দিক থেকে দৃষ্টি সরালো বাঘ। সবার উদ্দেশে বলল, ‘আজ আমি জীবনে প্রথম ক্যানভাসে ছবি আঁকব। লাইভ, মানে সরাসরি। এজন্য সবাইকে ডেকেছি।’

‘কী ছবি আঁকবে, ভাই?’ শুঁড় নাচিয়ে হাতি বলল।

‘ভিন্ন একটা প্ল্যান করেছি।’ হাতির দিকে তাকিয়ে বাঘ বলল, ‘ওইদিকে দেখুন।’

বাঘের ইশারায় দেখানো স্থানে চোখ ফেরালো সবাই। বটগাছের এক পাশেই স্তূপ করে রাখা অনেক ধরনের ফল।

‘হুঁ, দেখলাম।’ গম্ভীর কণ্ঠে শিয়াল বলল, ‘পাকা কলা, পাকা আম, পাকা আনারস আর গাজর, ভুট্টা, টমেটো এসব। তা এগুলোর সঙ্গে আজ আপনার ছবি আঁকার সম্পর্ক কী?’

ময়না বলল, ‘মনে হয় ওগুলো দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করানো হবে। তাই না হালুম?’

‘খুব ক্ষুদা পেয়েছে। আমি কিন্তু তিনটা কলা খাব।’ ছাগল বলল।

সজারু তার পিঠ দিয়ে খোঁচা দিল ছাগলকে, ‘শুধুই কলা? ছাগলে কী না খায়?’

‘তোমরা একটু থামো।’ জিরাফের দিকে তাকালো বাঘ, ‘আজকের এই আয়োজনের সমন্বয়ক জিরাফ। সে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে।’

জিরাফ গলা খাকারি দিয়ে বলল, ‘প্ল্যানটা হলো, খেয়াল করে দেখুন, ওইখানে যত ফলফলাদি রাখা, সবগুলোর রংই হলুদ।’

‘আরেহ, তাই তো!’ চিকন গলায় বলল ইঁদুর।

‘হ্যাঁ, তাই আজ হালুম হলুদ রঙের যত ফল আছে, একে একে সবগুলো আঁকবে। আঁকা শেষ হলে এই ফলগুলো সবাইকে দেওয়া হবে খাওয়ার জন্য।’

সিংহ বলল, ‘বুদ্ধিটা খারাপ না। এরপর সবুজ ফলফলাদির ছবি আঁকবে আর সেরকম ফল খাওয়াবে আমাদের, এই তো?’

'বাহ! এই না হলে আপনি বনের রাজা?' বাঘের কণ্ঠে প্রশংসা, 'একদম ঠিকঠাক বুঝে ফেলেছেন। কিন্তু সমস্যা হলো'...

'বানর হলুদ রঙের কৌটাটাই আনতে ভুলে গেছে, তাই তো?' কোকিল বলল।

'হুঁ।' বান্দরটা আর মনে হয় কোনোদিন সত্যিকারের বানর হবে না!' আফসোস করে বলল বাঘ।

'হালুম বস, আমি চলে এসেছি।' হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল বানরের।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাকালো বটগাছের দিকে। ডালের ওপর বানর বসা। হাতে একটা বড়োসড়ো কৌটা। সেটি দেখিয়ে বানর বলল, 'নিয়ে এসেছি, হলুদ রং।'

'ধন্যবাদ বানর।' বাঘ সন্তুষ্টির সুরে বলল, 'এরপর থেকে যেন এরকম ভুল আর না হয়। মনে থাকবে?'

'অবশ্যই।' বানর বলল, 'এরপর যেদিন সবুজ রঙের ফলফলাদি আঁকবেন সেদিন আমি সবুজ রঙের কৌটা এনে রাখব আগে থেকেই।'

তুলি হাতে নিয়ে ছবি আঁকার প্রস্তুতি নিল বাঘ। উপস্থিত সবার উদ্দেশে জিরাফ বলতে শুরু করল, 'সম্মানিত উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, হালুম এখনই ছবি আঁকা শুরু করবে। আপনারা এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি না করে মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করুন।'

'জিরাফ, গলাবাজি বন্ধ করো।' ধমকে উঠল গরু 'এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি আসল কাজ শুরু করা হোক।'

বাঘ সায় জানালো, 'গরুটা ঠিকই বলেছে। হলুদ রঙের কৌটাটা নাও।'

গাছের ওপর থেকে বানর বলল, 'জিরাফ, এই নাও, ধরো'।

জিরাফ গলা বাড়িয়ে বানরের হাত থেকে রঙের কৌটা নিতে গেল। তখনই ঘটল দুর্ঘটনা। বানরের হাত ফসকে কৌটাটা পড়ে গেল নিচে। পড়বি তো পড় একেবারে বাঘের মাথার ওপর। কৌটার ঢাকনা গেল খুলে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডোরাকাটা বাঘের শরীরটা প্রায় পুরোপুরি হলুদ হয়ে গেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেল সবাই। ততক্ষণে ঘটনাস্থল থেকে গাছে গাছে লাফিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে বানর।

বাঘের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল ছাগল। এরপর ইঁদুর। হাসি সংক্রমিত হয়। একে একে সজারু, কোকিল, ময়না, গরু, হাতি, শেয়ালসহ সবাই হাসতে লাগল। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারল না সিংহ। হেসে ফেলল ভয়ংকর শব্দে, বন কাঁপিয়ে।

জিরাফ ভীষণ বিব্রত! কী থেকে কী হয়ে গেল। বলল, 'হালুম বস, কোনো সমস্যা নেই, আমি এখনই আপনার শরীর থেকে হলুদ রং মোছার ব্যবস্থা করছি।'

'লাগবে না।' গর্জে উঠল বাঘ। সঙ্গে সঙ্গে হাসি থেমে গেল সবার। এমনকি সিংহও চুপ হয়ে গেল। ছাগলের দিকে তাকিয়ে বাঘ বলল, 'ছাগল, তুমিই প্রথম হেসেছ, তাই না?'

ছাগল মুখে কোনো ম্যা ম্যা শব্দ করল না। শুধু ভয়ে ভয়ে উপর-নিচ মাথা নাড়ালো।

'হুম!' কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে কী যেন ভাবল বাঘ। তারপর বলল, 'এখানে যেহেতু কোনো আয়না নেই, তাই বুঝতে পারছি না আমাকে কেমন দেখাচ্ছে।' ছাগল, তুমিই বলো, আমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে?'

কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলবে, শুনে বাঘ ক্ষেপে যায় কিনা ভেবে চুপ থাকল ছাগল।

জিরাফ অভয় দিয়ে বলল, 'বলো ছাগল, ভয় নেই।'

এক পলক আশপাশে সবার দিকে তাকালো ছাগল। তারপর ইতস্তত করে বলল, 'সত্যি বললে, এই মুহূর্তে হালুমকে দেখে মনে হচ্ছে আজ তার গায়ে হলুদ। আগামীকাল বিয়ে হবে!'

'ছাগল হলেও তুমি রসিক আছো।' বলেই বিকট শব্দে হেসে ফেলল বাঘ। তার সঙ্গে যোগ দিল সবাই। পুরো বন কেঁপে উঠল সম্মিলিত হাসির শব্দে।

আর ওদিকে, ভয়ে পালিয়ে যাওয়া বানরটি অনেক দূর থেকে হাসির শব্দ শুনে মনে মনে ভাবল, ঘটনা কী, সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে না তো! ❐

সিনিয়র কনটেন্ট ম্যানেজার, প্রথম আলো

কবিতা

হালুম মামার ডেরা

কাজল নিশি

হালুম হুলুম সুরটা তুলে
এসেছে বাঘ মামা,
হলদে কালো রং মিশ্রণে
গায়ে পরে জামা!

খিদের জ্বালায় কাহিল হয়ে
করছে হালুম হালুম,
হরিণ ধরতে আর কতকাল
শক্তি মেধা ঢালুম!

কষ্টের কথা শুনে খোকন
মাংস নিয়ে গেল,
চেটেপুটে খেয়ে আহা!
খুব আনন্দ পেল।

এই সুযোগে বাঘের সাথে
সবাই বনে বেড়ায়,
বন্ধুরা সব আড্ডা জমায়
হালুম মামার ডেরায়!

বর্ষা এল বঙ্গে

মামুন সরকার

মহিষ রঙা কালো মেঘে
আকাশ গেছে ছেয়ে
ধুলোবালির ঘূর্ণিপাকে
বৃষ্টি আসছে ধেয়ে।

ঝড়ো হাওয়ায় কারো কারো
উড়ে ঘরের চালা
মর্মর শব্দে ভেঙে পড়ে
আম-কাঁঠালের ডালা।

এলোমেলো বৃষ্টির ছাঁটে
নাকাল পথচারী
কাঁচা সড়ক কাদাজলে
হয় যে ভীষণ ভারী।

বৃষ্টির জলে পোকামাকড়
স্রোতের তোড়ে ভাসে
পুকুর পাড়ে দুলে দুলে
কাঁঠালচাঁপা হাসে।

পাখপাখালি ভিজে কাঁপে
বসে গাছের শাখে
দুষ্টুরা সব খেলার ছলে
কাদামাটি মাখে।

কদম কেয়া জুঁই কামিনী
পুষ্প ফোটার সঙ্গে
বৃষ্টি মেয়ের নূপুর পায়ে
বর্ষা এল বঙ্গে।

গল্প

রাসেল ভাইপার

আশরাফ পিন্টু

‘রাসেল ভাইপার! রাসেল ভাইপার!! মার! মার!! লাঠি আন শিগ্‌গির!’ ছোটো একটি নদীর পাশে ধানক্ষেত। কৃষকরা সারিবদ্ধ হয়ে ইরি ধান কাটছিল। অসহ্য গরম।

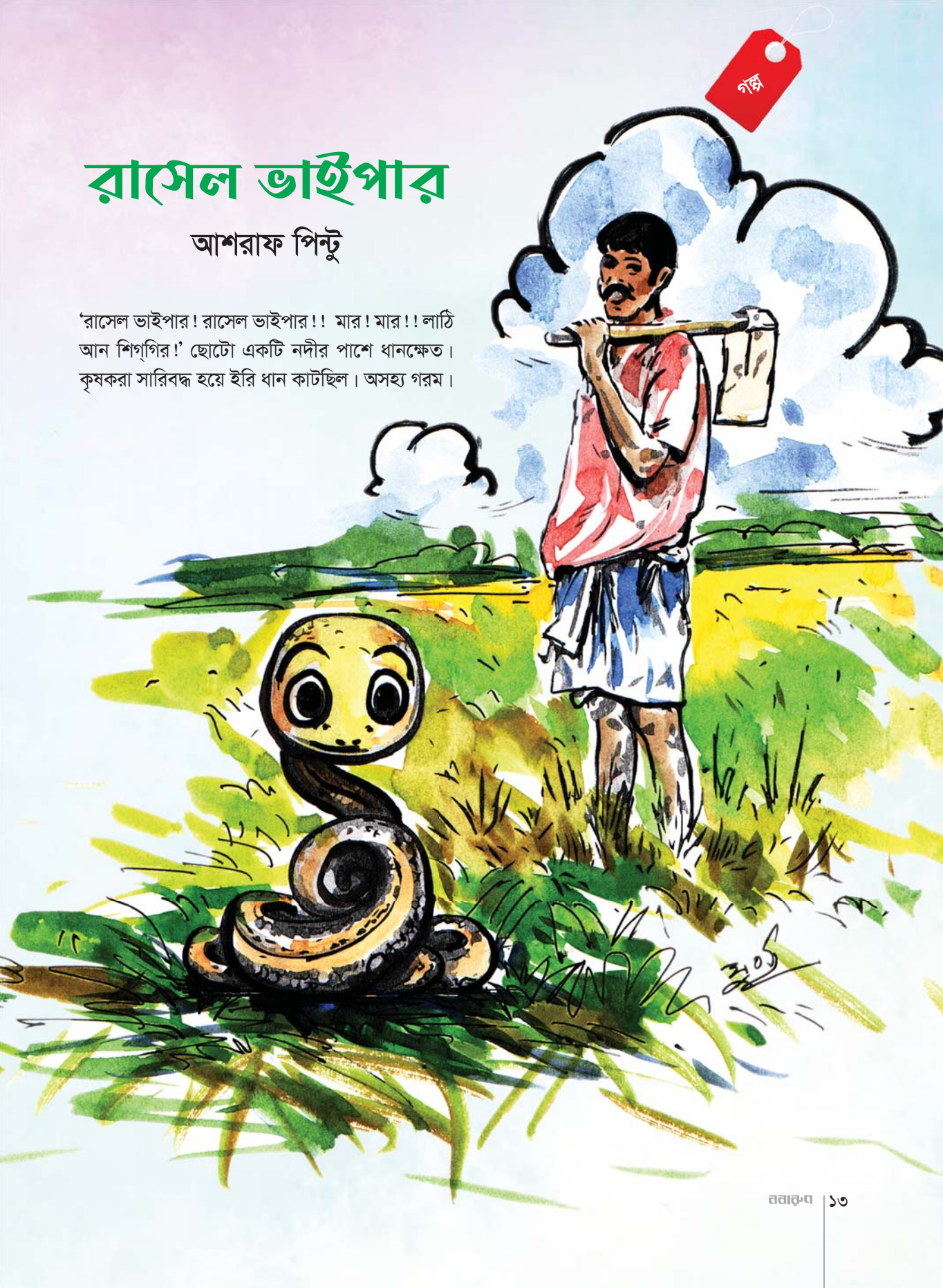

গ্রীষ্মের নদীতে তেমন পানি নেই। মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে। এতেই কিছুটা স্বস্তি। সবাই গুনগুণ করে গান গেয়ে ধান কাটছিল। হঠাৎ সারির ডানপ্রান্তের কৃষকটি জোরে চিৎকার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

অন্য একজন বলে, কোনে?

–ওই তো ধান গাছের ঝোপের মদ্যি।

নুইয়ে পড়া কিছু পাকাধান গাছের পাশে বড়ো বড়ো ঘাস জন্মে ছোট্ট ঝোপের মতো সৃষ্টি হয়েছে। কৃষকটি সেদিকে আঙুল তুলে দেখায়।

–কই সাপ? মার! মার শিগ্‌গির!

অন্যরা ইতোমধ্যে শাবল, বাঁশের টুকরো,গাছের ডাল ইত্যাদি সাপ মারার দেশীয় অস্ত্র নিয়ে এসেছে।

–ওই তো ঝোপের মদ্যি লুকায়া আছে।

–দে বাড়ি।

প্রত্যক্ষদর্শীর কথামতো একজন ঝোপের ভিতরে বাঁশের লাঠি দিয়ে আঘাত করে। কিন্তু ওখান থেকে নড়াচড়া বা কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

–এক বাড়ি দিলি অয়? আরেকটা দে।

এবার আরেকজন গাছের ডাল দিয়ে পর পর দু-তিনবার ঝোপের মধ্যে খোঁচা মারে। কিছুক্ষণ পর সত্যি সত্যি একটা বড়ো আকারের সাপ ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। সাপটির গা রাসেল ভাইপার বা চন্দ্রবোড়ার মতো হলেও মাথার আকৃতি সচরাচর সাপের মতো নয়- অনেকটা এলিয়েনের মতো।

–কী দেখছিস দাঁড়ায়া? শিগ্‌গির বাড়ি দিয়া মাইরা ফ্যাল। কামুড় দিবো। কাঁচি দিয়া কোপ লাগা। রাগতস্বরে আরেকজন বলে।

এমন সময় সবাইকে অবাক করে দিয়ে সাপটি পিছনের দু'পায়ে ভর করে বেজির মতো দাঁড়িয়ে পড়ে।

সাপকে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়ানো দেখে সবাই হকচকিয়ে যায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে কিছুক্ষণ। এমন সময় সবাইকে আরেক দফা অবাক করে দিয়ে সাপটি কথা বলে ওঠে, আমাকে মারবেন না।

সাপের মুখে মানুষের মতো কথা বলা দেখে সকলে থ মেরে যায়। কারো মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয় না। কেউ একজন ফিসফিসিয়ে বলে, রাসেল ভাইপার না এটা, জিন-টিন হবে; কেউ বাড়ি দিস না।

অন্যরা কথায় সায় দিয়ে সাপকে প্রহার করা থেকে বিরত থাকে। কেউ কেউ জিনের ভয়ে কুঁকড়ে যায়।

এমন সময় সাপটি বলে ওঠে, এ জায়গার নাম কী?

–আমাগো গাঁয়ের নাম গোপীনাথপুর।

–এটা আবার কেমন নাম?

–তোমার নাম কী? তুমি কোনথে আইছো?

–আমার নাম নিনি ভাইপার। 'নানানা' গ্রহ থেকে এসেছি।

–এটা আবার কেমুন নাম?

–অনেক দূরের একটি গ্রহ। ওটাই আমাদের দেশ। এটা কোন দেশ?

–আমাগো দেশের নাম বাংলাদেশ।

–কোন গ্রহ?

এবার কৃষকেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। একজন আরেকজনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, গ্রহ কী?

আরেকজন বলে, রাসেলকে জিগালে ও কইতে পারব।

রাসেল নামে এক কৃষকের ছেলে ধান কাটতে এসেছিল। ক্লাস সেভেনে পড়ে। সে জবাব দেয়, আমাগো গ্রহের নাম পৃথিবী।

–পৃথিবী! এই নাম তো শুনিনি আগে?

–তোমরা বইতে পড়োনি? রাসেল বলে।

–না।

–তবে না জাইনা না শুইনা এহানে আইছো ক্যান? রাগতস্বর রাসেলের।

–সে অনেক দুঃখের কথা! আমাকে আসলে গ্রহান্তরে পাঠানো হয়েছে।

–কীসের জন্যি?

–শাস্তিস্বরূপ।

–আমাগো দ্বীপান্তরের মতো?

–হয়ত তাই।

–কোন কামে তোমাকে শাস্তি দেওয়া অইছে?

–দুর্নীতি আর পাপের জন্য।

–তোমগো দ্যাশের আইন বুঝি খুব কড়া?

–শুধু কড়াই নয়, পাপ করার জন্য আমাদের নাম ও চেহারাও পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে; যাতে আমাদের কেউ চিনতে না পারে আমরা 'নানানা' গ্রহের বাসিন্দা।

–তাইলে তো দ্যাশে ফিরা যাওয়ার উপায় নাই। আমগো এহানেই থাকতে অইব।

–জি।

–কিন্তু কার সাথে থাকবা? এহানে তো তোমার স্বজাতি কেউ নাই। একা একা সময় কাটাবা কী কইরা?

–আমাকে এখানে পাঠানোর সময় বলে দেওয়া হয়েছিল যে এখানে আমার স্বজাতি আছে। তোমরা কি জানো আমার স্বজাতি কোথায় আছে?

রাসেল মাথা নেড়ে না-বোধক জবাব দেয়। ও অন্যদের কাছে জানতে চায়- নিনির স্বজাতিকে তারা চিনে কিনা। কিন্তু সবাই মাথা নেড়ে না-বোধক জবাব দেয়।

এবার নিনি ওদের অক্ষমতার কথা বুঝতে পেরে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে গুঁইসাপের মতো গুটিগুটি পায়ে পাশের নদীর দিকে চলতে থাকে। হঠাৎ সে নদীর জলে সাঁতরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

রাসেল নিনির পিছনে পিছনে দৌড়ে এসে নদীরপাড়ে দাঁড়ায়। নিনির অদৃশ্য হওয়া জলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কিন্তু নিনিকে আর দেখা গেল না। মনের দুঃখে নিনি চলে গেল দূর অজানায়। ❐

সহকারী অধ্যাপক, মনজুর কাদের মহিলা কলেজ, পাবনা

বৃষ্টি নামে

মনির জামান

আকাশে ভীষণ মেঘ গুড়গুড়
দুপুর জুড়ে টাপুরটুপুর
বৃষ্টি এসে টিনের চালে
বাজায় কার পায়ের নূপুর?

খোলা জানালায়
চোখ চলে যায়
বৃষ্টি কেমন পাতা নাচায়
কাক ভিজে যায়
গাছ ভিজে যায়
বৃষ্টি তবে আঁধার নামায়?

খোকার এখন ঘুমের সময়
বৃষ্টি আসে আঁকার খাতায়
মা বলে এখন ঘুমা না
খোকার যে ঘুম আসে না।

বৃষ্টিগুলো

আনোয়ারুল হক নূরী

মেঘ ঢেলেছে বৃষ্টি খই।
বৃষ্টি ঝরার লিস্টি কই?
টাপুরটুপুর ছন্দ নূপুর।
দৃষ্টি কাড়ে মেঘলা দুপুর,
কাজলকেশী মেঘ কিশোরী
মন হারানোর গল্প বুনে।
ব্যাঙের ছাতায় মৌটুসিটা
জলঢেউ রূপকল্প গুণে,
জল আদরে পাখ ছড়ালো,
বাদলা হাওয়ায় দিন গড়ালো
মন গেল ওই মেঘের বন
বাদল জলে বাঁধল ঘর।
বইয়ের পাতা মাতায় না মন
বৃষ্টিগুলো ছাতায় ভর।

সাপে কামড়ালে প্রাথমিক চিকিৎসা

বাংলাদেশে ১২ প্রজাতির সামুদ্রিক সাপসহ প্রায় ৮০ প্রজাতির সাপ দেখা যায়। এদের মধ্যে শুধু ছয় ধরনের সাপ বিষধর। এগুলো হলো – চন্দ্রবোড়া বা রাসেলস ভাইপার, গোখরা বা কোবরা, পদ্মগোখরা বা রাজগোখরা বা কিং কোবরা, শঙ্খিনী বা ব্যান্ডেড ক্রেইট বা কেউটে, সবুজ সাপ বা গ্রিন স্নেক এবং সামুদ্রিক সাপ বা সি স্নেক। গ্রামাঞ্চলের মানুষই সাপে কাটার শিকার হয় বেশি।

বিষাক্ত সাপ দংশন করলে দংশিত স্থানে কোনো চিহ্ন না-ও থাকতে পারে। তবে চামড়ার রং পরিবর্তন, কালচে হওয়া, ব্যথা, দ্রুত ফুলে যাওয়া, ফোসকা পড়া, পচন, চোখের পাতা ভারী হওয়া বা বুজে আসা, জিহ্বা জড়িয়ে আসা, কথা বলতে অসুবিধা হওয়া, ঢোক গিলতে অসুবিধা, , হাঁটতে অসুবিধা, হাত-পা অবশ ভাব, ঘাড় দুর্বল, মাথা হেলে যাওয়া, শ্বাসপ্রশ্বাসের অসুবিধা, কালো রঙের প্রস্রাব ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা : সাপে কামড়ালে ভয় না পেয়ে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। রক্তক্ষরণ হলে দংশিত জায়গা চাপ দিয়ে ধরে রাখা এবং ব্যান্ডেজ/লম্বা কাপড় (৩ থেকে ৪ ইঞ্চি চওড়া) গামছা অথবা ওড়না দিয়ে হালকা চাপ দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এমনভাবে বাঁধতে হবে যেন অনেক বেশি শক্ত অথবা ঢিলা না হয়। কপালে কামড় দিলে বসে যেতে হবে, হাঁটা যাবে না। হাতের দংশনে হাত নড়াচড়া করা যাবে না। দংশিত ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার জন্য মোটর বাইক বা অ্যাম্বুলেন্সের সাহায্য নিতে হবে। রোগীকে এক পাশ কাত করে রাখতে হবে। যদি শ্বাসপ্রশ্বাস না থাকে, তাহলে মুখে বায়ু ঢোকার নল ব্যবহার করা এবং প্রয়োজন হলে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস সঞ্চালনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ব্যবস্থাপত্র : চিকিৎসার স্বার্থে প্রথমে জেনে নেওয়া প্রয়োজন-ওই দংশন বিষাক্ত সাপের ছিল কি না বা আদৌ বিষক্রিয়া ঘটেছে কি না। হাসপাতালে পৌঁছালে সেখানে সার্বিক পর্যবেক্ষণ করবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। সাপের বিষের প্রতিষেধক ওষুধ 'অ্যান্টিভেনম' ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

যা করা ঠিক নয় : দংশিত অঙ্গে কোনো রকম গিঁট দেওয়া যাবে না। দংশিত স্থানে কাটা, সুঁই ফুটানো কিংবা কোনো রকম প্রলেপ না লাগানো। ওঝা বা বৈদ্য দিয়ে চিকিৎসা করে কিংবা ঝাড়ফুঁক করে অযথা সময়ক্ষেপণ না করা।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

গল্প

ব্যাঙের শহর দেখা

হুমায়ূন কবীর ঢালী

ব্যাঙা আর ব্যাঙি। দুই ব্যাঙ। দুই বন্ধু। ব্যাঙা নাদুসনুদুস। ব্যাঙি হালকা-পাতলা। ওরা বাস করে মিয়াবাড়ির পূবপাশের একটা ডোবার কাছে। ডোবার পশ্চিম পাড়ে বড়ো একটা বাঁশঝাড়। বাঁশঝাড়ের একটি গর্তে ওদের বাসা। মাঝেমধ্যে দরকার হলে বাসা থেকে বের হয়। ডোবায় নেমে গোসল করে। অন্য ব্যাঙের সাথে পানিতে ডুবসাঁতার খেলে। হইচই, ফূর্তি করে। ফের উঠে আসে নিজেদের বাসায়। একরকম সুখে-শান্তিতেই দিনযাপন করছে ওরা।

একদিন ওদের মনে শহর দেখার শখ জাগল। কী করে শহরে যাওয়া যায়? গ্রাম থেকে তিন কিলোমিটার দূরে শহর। দুই কিলোমিটার পথ একদিনে পেরুনো সম্ভব। তবে কী করে, কোন পথে যাবে, এই নিয়ে দুই ব্যাঙ কয়েকদিন ধরেই বুদ্ধি-পরামর্শ করছে। কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না।

দুটো পথে শহরে যাওয়া যায়। হয় পাকা সড়ক ধরে নয় মেঠো পথে।

গ্রাম থেকে দু'শ গজ পার হলেই পাকা সড়ক। তবে সড়ক পথে যাওয়ার ঝক্কি অনেক। বিপদের আশঙ্কা বেশি। গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মরার ভয় আছে।

তাই ওরা মেঠো পথে যাওয়াই উত্তম মনে করল। মেঠো পথে ক্ষেতের আইল ধরে যেতে যেতে দু-একটা পোকামাকড় খেয়ে আহারাদির কাজটাও সেরে ফেলা যাবে। অবশ্য এ পথেও একটা সমস্যা, পথের মাঝামাঝি একটা পুরনো পরিত্যক্ত বাড়ি আছে। তার পাশ ঘেঁষে যেতে হবে ওদের। বন্ধুবান্ধব ও লোকমুখে শুনেছে পুরনো সেই বাড়িটায় গুঁইসাপ আর বিষধর সাপেদের বাস। গুঁইসাপ কিংবা অন্য সাপেরা যদি টের পায় যে তার বাড়ির পাশ দিয়ে দুটো ব্যাঙ যাচ্ছে, তবে আর রক্ষা নেই। গপ করে ধরে খেয়ে ফেলবে।

'তাহলে কী করা? শহর দেখার চিন্তা কি বাদ দেবে?' ব্যাঙি জানতে চাইল।

'তা বাদ দেবো কেন? এত ভয় পেলে বাঁচা যাবে না। যা হবার হবে। চলো, মেঠোপথেই রওনা দেই।' ব্যাঙা সাহসের কথা শোনালো।

'ঠিক আছে, তুমি যখন সাহস দিচ্ছ, আমার যেতে আপত্তি নেই।' ভরসা খুঁজে পেল ব্যাঙি।

পরদিন সকালে ব্যাঙা আর ব্যাঙি ডোবায় গোসল সেরে রওনা দিল শহরের উদ্দেশ্যে। ব্যাঙা সামনে আর পেছনে পেছনে ব্যাঙি। বৈশাখের খরতাপ চলছে। তাপমাত্রা চল্লিশের কোঠায়। এমন তাপে বিলে কেন, ডোবায়ও টিকে থাকা দায়। এরপরও দমে গেলে চলবে না। এগোতে হবে। কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে। তাদের মিলবে শহর। আহারে শহরে না জানি কী মজা আর আনন্দ অপেক্ষা করছে! কোনোরকমে বিলটা পার হতে পারলেই হয়। এরপর আর কদ্দুর? কয়েক লাফে পার হয়ে যাবে বাকি পথ।

ওরা ক্ষেতের আইল ধরে যে বিলটা পেরোচ্ছে; সেই বিলজুড়ে ইরি ধানের পাথার। দু-একটা ধানক্ষেতে পানি জমে আছে। গরম সইতে না পারলে টুপ করে পানিতে নেমে পড়বে।

অনেকক্ষণ চলার পর ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ক্ষুধাও পেল। জিরিয়ে নেওয়া দরকার। একটা ধানক্ষেতের কোণায় বসল ওরা। এ সময় ব্যাঙার সামনে একটা ঘাসফড়িং কোত্থেকে এসে লাফিয়ে পড়ল। ব্যাঙার জিভে পানি এসে গেল। কী দারুণ! কতদিন হয় এমন শিকার মিলে না! ক্ষুধাটাও পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠেছে। শিকারটাকে হাতছাড়া করা যাবে না। দেরি না করে ব্যাঙা ঘাসফড়িংটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু কাজ হলো না। যথাসময়ে ঘাসফড়িং সটকে পড়ল। শরীরের ভার সামলাতে না পেরে ব্যাঙা ঝপাং করে ধানক্ষেতের পানিতে আছড়ে পড়ল।

ব্যাঙার অবস্থা দেখে ব্যাঙি হেসে উঠল।

'হাসবে না কিন্তু। মেজাজ খুব খারাপ।' ধানক্ষেত থেকে বলল ব্যাঙা।

ব্যাঙি বুঝতে পারল ব্যাঙা এখন ঘাসফড়িংয়ের রাগ তার উপর ঝাড়বে।

ব্যাঙি হাসি চেপে রাখল। বলল, 'তুমি কি পানিতেই বসে থাকবে, নাকি উপরে উঠে আসবে?'

'ভাবছি, যা গরম পড়েছে, পানিতে একটু শরীরটা ঠাণ্ডা করে নেই।'

তাই তো! আমিও নামছি না কেন তাহলে!'

ঝুপ করে পানিতে নেমে গেল ব্যাঙিও।

'ঘাসফড়িংটাকে ধন্যবাদ।' ব্যাঙা বলল।

'ঘাসফড়িংকে কেন ধন্যবাদ দিচ্ছ? ওর জন্য তুমি এখানে আছড়ে পড়লে।'

'আছড়ে পড়ে কি খারাপ হলো? পানিতে কি ভালো লাগছে না তোমার?'

‘তা লাগছে।’

‘এই জন্যই ঘাসফড়িংকে ধন্যবাদ দিলাম।’

‘তুমি একা দেবে কেন। ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকেও।’

কিছুসময় ওরা ধানক্ষেতের পানিতে ডুবে রইল। বিকেল হয়ে এল। শরীরটাও ঠান্ডা হলো। ওরা উঠে এল ক্ষেতের আইলে। ফের সামনের দিকে থপ থপ করে এগোতে শুরু করল। একসময় বিল পেরিয়ে পরিত্যক্ত বাড়িটার কাছে চলে এল ওরা। যাক, ভালোয় ভালোয় বাড়িটা পেরোতে পারলেই হয়!

‘এই ব্যাঙি, একটু জোরে পা চালাও।’ ব্যাঙা তাড়া দিলো।

‘আমার কথা ভাবতে হবে না। তুমি সতর্ক থেকো। শত্রুর গন্ধ পাচ্ছি।’

হ্যাঁ, আমার কাছেও তাই মনে হচ্ছে। এগুনো ঠিক হবে না।’

দুই বন্ধু চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এক জায়গায় চুপচাপ বসল।

ওদের আশঙ্কাই সত্যি হলো। ওরা দেখতে পেল, ওদের পথের পাশে একটা বিষধর গোখরা সাপ ফণা তুলে বসে আছে।

ওরে বাপরে! ব্যাঙা আর ব্যাঙি দে ছুট। বড়ো বড়ো লাফ দিয়ে ডানদিকের একটা মরিচক্ষেতে ঢুকল ওরা। কিছুদূর এগিয়ে পেছনের দিকে তাকালো। বুঝতে পারল সাপটা ওদের তাড়া করছে না। যাক, বাঁচা গেল!

বাম দিকে আর নয়। ওরা ডানদিকের কোনো রাস্তা খুঁজতে শুরু করল। পেয়েও গেল একটা রাস্তা। মরিচক্ষেতের আইল ধরে এগোতে শুরু করল। থামল কিছুদূর গিয়ে।

'তুমি কি এখান থেকে শহরটা দেখতে পাচ্ছো? আমরা সম্ভবত শহরের কাছাকাছি চলে এসেছি।' ব্যাঙা জানতে চাইল।

ব্যাঙি বলল, 'মোটেও না। আমি শুধু তোমার পিঠটাই দেখতে পাচ্ছি।'

'আরে কী বলছো! আমি না হয় একটু মোটাসোটা হয়ে গেছি। বেশি লাফাতে পারছি না। তুমি তো একটু জোরে লাফিয়ে শহরটা দেখতে পারো।'

ব্যাঙি লাফিয়ে শহর দেখার চেষ্টা করল।

'কী দেখতে পেলে?'

'হ্যাঁ, দেখেছি। তবে শহর না। আমাদের গ্রামটাই দেখা যাচ্ছে।'

'তার মানে, আমরা এখনো গ্রামের কাছেই রয়ে গেছি?'

ওরা আবার চলতে শুরু করল। অনেকক্ষণ পর ব্যাঙির কাছে ব্যাঙা জানতে চাইল, 'এখন শহরটা দেখা যায় কিনা, একটু দেখবে?'

'কেন নয়, এক্ষুণি দেখছি।' ব্যাঙি লাফিয়ে শহর দেখার চেষ্টা করল। এবার শহরটাকে দেখল সে।

' আরে এ যে দেখছি দারুণ ব্যাপার-স্যাপার! কত সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং!'

'তাই নাকি? ইশ! মোটা হবার যত জ্বালা। দূর থেকে একটু শহরটা দেখব, তাও কপালে জুটল না। যাক, আর সামান্য পথ। এরপর কাছে থেকেই শহরটা ভালো করে দেখব।'

'তুমি বুঝি একাই দেখবে। আমি দেখব না!' ব্যাঙি অভিমানের সুরে বলল।

'না তা হবে কেন। দু'বন্ধুই দেখব।'

কথা বলতে বলতে ওরা এগিয়ে গেল শহরের খুব কাছাকাছি। এখান থেকে না লাফিয়েই শহর দেখা যায়।

'কী সুন্দর শহর! ভাগ্যিস শহর দেখার ইচ্ছেটা হয়েছিল। না হলে এমন সুন্দর শহরটা না দেখেই মরতে হতো।' ব্যাঙা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল।

'এসব কথা এখন বাদ দাও। চলো, এগিয়ে যাই। এদিকে গাছগাছালি কম। শহরে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগবে না।' ব্যাঙি বলল।

ওরা আর এগোতে পারল না। উপর থেকে একটা চিল ওদের ছোঁ মারল। তবে যথাসময়ে লাফিয়ে একটা ধুতরা গাছের আড়ালে আশ্রয় নেওয়ায় প্রাণে বেঁচে গেল।

ভয়ে কাঁপছে দুই বন্ধু। সেই সাথে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে চিলটার উপর। শিকার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় মেজাজ দেখাতে শুরু করেছে চিলটা। শূন্যে পাক খেয়ে একবার মাটির কাছাকাছি নামছে, আবার উড়ে যাচ্ছে দূরে উপরে। উপর থেকে ওদের খুঁজছে। ওরা আরো আড়ালে যাওয়ার চেষ্টা করল। পারল না। ব্যাঙা উঁকি দিয়ে দেখল আশপাশে কোথাও নিরাপদ জায়গা আছে কিনা। না, ওদের গ্রামের মতো এখানে তেমন নিরাপদ জায়গা নেই।

তবে চিলটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। এখনই ওদের এগিয়ে যেতে হবে। দেরি করা ঠিক হবে না।

'চলো, সামনে যাই।'

ব্যাঙা লাফিয়ে সামনের একটা গাছের আড়ালে লুকালো। সে একাই গেল। ব্যাঙি পড়ে রইল আগের জায়গাতেই। সে চেচিঁয়ে ডাকল ব্যাঙিকে।

'কী ব্যাপার, তুমি আসছ না কেন?'

'আমি তো লাফাতে পারছি না। আমার ডান পা কেটে গেছে। রক্ত ঝরছে। সম্ভবত, চিলটা আমাকে নিতে না পারলেও ওর নখের আঁচড়ে আহত করে গেছে।'

'কী বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ, খুব ব্যথা করছে। আমাকে বাঁচাও বন্ধু।'

ব্যাঙা একমুহূর্ত দেরি না করে ব্যাঙির কাছে ছুটে গেল। ব্যাঙির অবস্থা দেখে মনে মনে খুব আহত হলো। ভাগ্যিস চিলটার ছোঁ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। নয়তো বন্ধুকে আজ হারাতে হতো। কেন যে শহর দেখার সাধ

হলো! সে যাক, এখন বন্ধুকে সেবা দিয়ে ভালো করে তুলতে হবে।

‘বন্ধু, কষ্ট হলেও তুমি একটু ধৈর্য ধরো। আমি দেখছি, কোথাও ওষুধ পাওয়া যায় কি-না?’

গ্রামের মতো এখানে লতাপাতা তেমন নেই। লতাপাতা না থাকলে ওষুধ পাবে কোত্থেকে! তবুও ওষুধের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল ব্যাঙা। একটু পরেই ফিরে এল ওষুধ নিয়ে। ওষুধ বলতে একটা বুনোলতা। এটার রস কাটা ঘায়ে লাগিয়ে দিতে হবে। দেরি না করে তাই করল ব্যাঙা। এরপর ব্যাঙিকে বলল, ‘তুমি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে। জায়গাটাও আমাদের জন্য মোটামুটি নিরাপদ।’

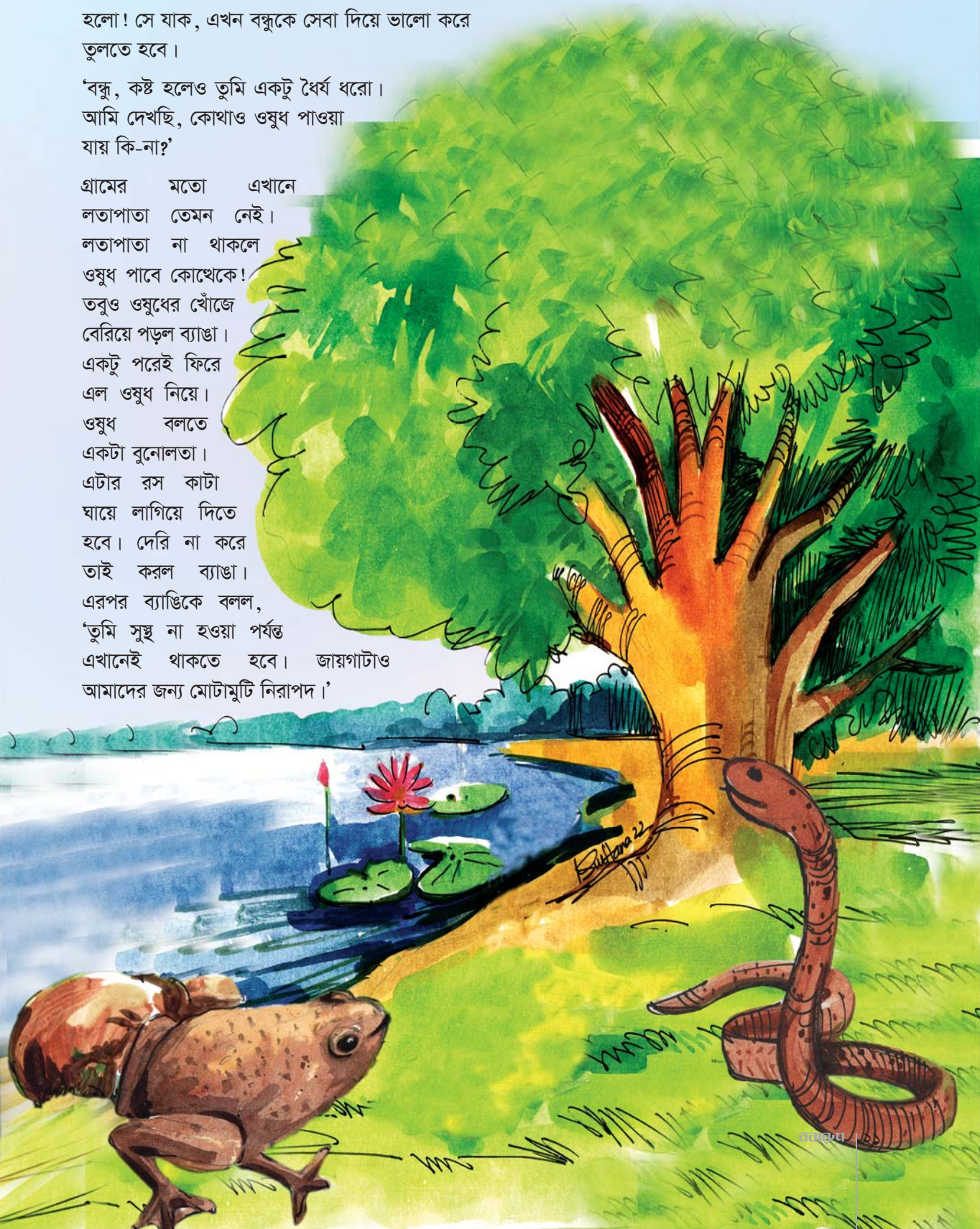

‘না, মোটেও নিরাপদ নয়। তুমি যখন ওষুধ আনতে গিয়েছিলে একটা বেজিকে ছুটে যেতে দেখেছি।’ ব্যাঙি বলল।

‘বলো কী! তাহলে এখানে আর একমুহূর্তও দেরি করা ঠিক হবে না।’ ব্যাঙা আশঙ্কা প্রকাশ করল।

‘কিন্তু আমি তো লাফাতে পারব না।’

‘তাই তো! এখন কী করা যায় বন্ধু? একটা উপায় তো বের করতেই হবে।’

‘আমি কোনো উপায় দেখছি না। তুমি না হয় শহরটা দেখে এসো। আমি এখানেই থাকি।’

‘মোটেও না। আমরা না বন্ধু? মরতে হয় দুজনেই মরব। তবুও তোমাকে বিপদে ফেলে রেখে শহর দেখা তো দূরে থাক, এক পা ও নড়ছি না।’ এরপর ব্যাঙা কী যেন ভাবল। ভেবে বলল, ‘আমি একটা বুদ্ধি পেয়েছি।’

‘বুদ্ধিটা কী বলো।’

‘তুমি আমার পিঠে চড়ে বসবে।’

‘তারপর?’

‘তারপর আমরা শহরে চলে যাব।’

‘তুমি আমার ভার বইতে পারবে তো?’

‘এমনি এমনি কি শরীরটাকে নাদুসনুদুস বানিয়েছি। তোমার মতো টিংটিঙে ব্যাঙিকে বয়ে নিতে আমার মোটেও কষ্ট হবে না। তাড়াতাড়ি আমার পিঠে উঠে পড়ো।’

ব্যাঙার পিঠে বসল ব্যাঙি। ব্যাঙা থপথপ করে এগিয়ে গেল শহরের দিকে। ব্যাঙা ভেবেছিল বন্ধুকে পিঠে নিয়ে একটু কষ্ট হবে। কিন্তু তার মোটেও কষ্ট হচ্ছে না। বন্ধুর ভার যে কষ্টকর নয়, আজই প্রথম বুঝতে পারল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা শহরের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

শহরে ঢুকতেই বড়ো একটা ডোবা। ডোবাটা পেরুলেই শহর। এরপর আনন্দ আর আনন্দ! ঘুরে ঘুরে দু’বন্ধু শহর দেখবে। বসবাসের একটা জায়গা পেয়ে গেলে দরকার হয় শহরেই থেকে যাবে। বাকি জীবনটা শহরেই কাটিয়ে দেবে।

ব্যাঙার পিঠ থেকে নেমে এল ব্যাঙি। তার ব্যাথাটা আগের চেয়ে অনেক কম। তবে এখনই পানিতে নামা ঠিক হবে না। ব্যাঙাকেও বলল সে কথা। ব্যাঙার তর সইছে না শহর দেখার জন্য। কিন্তু বন্ধুকে কষ্টে রেখে কোনো আনন্দ আর আনন্দ থাকে না। তারা একটা গাছের আড়াল খুঁজল। পেয়েও গেল। ঝোপালো ধুতরা গাছ। তার নিচে গিয়ে দুজন বসল।

‘যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে না উঠবে, এখান থেকে নড়ছি না।’ ব্যাঙা বলল।

‘আশা করছি খুব শিগ্‌গির সেরে উঠব। এখন আর আগের মতো ব্যথাটা নেই।’

‘তাহলে তো ভালোই হলো। তুমি বসো এখানে। আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে। দেখি কোথাও খাবার জোটে কিনা।’

ব্যাঙা বেরিয়ে গেল। ঘুরে ঘুরে পোকামাকড় যা পেল খেয়ে নিল। ফেরার পথে ব্যাঙির জন্যও নিয়ে এল।

‘ধন্যবাদ বন্ধু।’ খেতে খেতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল ব্যাঙি।

খেয়েদেয়ে দুজন বিশ্রাম নিল। বিকেল হলে একসময় ডোবায় ঝাঁপ দিলো দু’বন্ধু। ডোবার পানি খুব নোংরা। কিন্তু শহর দেখার স্বপ্নে ওরা এতটাই বিভোর যে, চারপাশের সব অস্বাভাবিকতা ওদের কাছে এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

ওরা সাঁতার কেটে এগোচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা ডোবার অন্যপ্রান্তে পৌঁছে গেল। এখন তীরে উঠলেই শহর।

কিন্তু তীরে ওঠার আগেই কোত্থেকে এক কোলাব্যাঙ এসে ওদের পথরোধ করল।

‘থামুন। থামুন নতুন অতিথিদ্বয়।’

ভারি গলা শুনে চমকে উঠল ব্যাঙা-ব্যাঙি। ওরা থেমে গেল।

‘আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?’

‘গ্রাম থেকে।’

‘কেন এসেছেন?’

‘শহর দেখব।’

‘না, আপনারা শহর দেখবেন না।’

‘কীসব বাজে বকছেন। শহর দেখার আশায় কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে জানেন? ব্যাঙি তো মরেই গিয়েছিল চিলের ছোঁয়ায়।’ ব্যাঙা বলল।

‘কিন্তু আপনারা কি জানেন শহরে বিপদ আরো বেশি? আপনাদের মতো আমি আর আমার বন্ধু শহর দেখতে এসেছিলাম।’

‘দেখেছেন?’

‘দেখব কোত্থেকে? দেখছেন না আমি একা!’

‘হ্যাঁ, তাই তো! আপনার বন্ধু কি শহর দেখতে গিয়েছে?’

‘আমরা দু’বন্ধু শহরে উঠেছিলাম। কিন্তু একটা মানুষ আমার বন্ধুটাকে ধরে নিয়ে গেছে। আমি দ্রুত পালিয়ে বেঁচে গেছি। সেই থেকে এই ডোবায়ই আছি। প্রথম প্রথম এমন নোংরা ডোবায় থাকতে খুব কষ্ট হতো। এখন সয়ে গেছে। ভেবেছিলাম গ্রামে ফিরে যাবো। কিন্তু বন্ধুর কথা মনে পড়লে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। দু’বন্ধু এসে একা ফিরে যাব?’

‘বলেন কী! কিন্তু আমরা দু’বন্ধুও তো শহরে ঢুকতে চাই।’

‘এই ভুল করবেন না। এখানে আমাদের শত্রু সাপ, গুঁইসাপ এসব প্রায় নেই, এটা ঠিক। তবে শহরে আরো অনেক বিপদ। প্লিজ, গ্রামে ফিরে যান।’

কোলাব্যাঙের কথা শুনে ভাবনায় পড়ল ব্যাঙা-ব্যাঙি। কী করবে এখন?

ব্যাঙি বলল, ‘দাদা যখন বলছেন চলো গ্রামে ফিরে যাই। আমি তোমাকে হারাতে পারব না। শহর দেখার চেয়ে তুমি আমার কাছে অনেক বড়ো আনন্দের।’

‘ঠিকই বলেছ। আমরা কেউ কাউকে হারাতে চাই না।’ ব্যাঙা বলল।

‘দাদা, তাহলে আপনিও চলুন আমাদের সাথে। এখানে একা একা থেকে আর কী করবেন। বরং মানুষের হাতে ধরা পড়ার ভয় আছে।’

‘না বোন, আমি এখানেই থাকব। হারানো বন্ধুর কথা ভেবে ভেবে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবো।’

ব্যাঙা বলল, ‘ঠিক আছে। প্রার্থনা করি আপনি ভালো থাকেন। ব্যাঙি, চলো ফিরে যাই। যে শহরে বেঁচে থাকাই সমস্যা, সেখানে আনন্দ করা যায় না।’

এরপর ব্যাঙা আর ব্যাঙি শহরে না গিয়ে গ্রামের পথে পা বাড়ালো। শহর দেখে আর কাজ নেই বাবা।

তারা ফিরে গেল সেই বাঁশঝাড়ে নিজেদের বাড়িতে। ❐

শিশুসাহিত্যিক

কবিতা

ব্যাঙের মেয়ের বিয়ে

মাহফুজ রুমান খান

আষাঢ় মাসের বারো তারিখ
ব্যাঙের মেয়ের বিয়ে
পাবদা কাতল বোয়াল এল
সাথে মিষ্টি নিয়ে।

দু-দিন ধরে খায় না তেমন
ব্যাঙের মেয়ে পান্না,
মা'কে ছেড়ে যেতে হবে
ভাবলে আসে কান্না।

বিয়ের দিনে লাল শাড়িতে
পাচ্ছে ভীষণ লজ্জা,
দুষ্টু পুঁটি শিখিয়ে দিল
বরকে করতে কব্জা।

জাদুর ছোঁয়া

সরোয়ার রানা

তালে তালে ঝিঁঝিঁর ডাকে
জোনাক পোকা নাচে
পথ ভুলে এক জোনাক পোকা
আসলো আমার কাছে।

মিটিমিটি জ্বলল আলো
তারার মতো করে
একটু পরে উড়ে উড়ে
গেল আঁধার ঘরে।

ছনের চালার বেড়ার ঘরে
দলবেঁধে সব এল
জাদুর ছোঁয়ায় ঘরটা যেন
প্রাসাদ হয়ে গেল।

আজকে আমি রাজপুত্তুর
জোনাকিদের সাথি
আনন্দে আজ সারাটা রাত
করব মাতামাতি।

আরেক জন পিপলু

তারিক মনজুর

জামসেদ স্যার মজা করে ক্লাস নেন। কিন্তু পিপলুর মোটেও মজা লাগে না। পিপলুর আসলে কোনো স্যারের পড়াই মজা লাগে না। স্যাররা যখন পড়ান, পিপলু তখন মনে মনে ছড়া বানায়।

আজ জামসেদ স্যার ক্লাসে কী যেন একটা বিষয় নিয়ে পড়াচ্ছেন। অন্যরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে। কিন্তু পিপলু মনে মনে 'আকাশ' নিয়ে একটা ছড়া বানাতে শুরু করল:

ওই দেখা যায় আকাশ।

ওই আকাশের দিকে কেন

এমন করে তাকাস?

জামসেদ স্যার পিপলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পিপলু, তুমি ঠোঁট নাড়ছ কেন?'

পিপলু দাঁড়িয়ে নীচু গলায় বলল, 'ভুল হয়ে গেছে, স্যার।'

জামসেদ স্যার বললেন, 'এটা তো ভুলের কিছু না। প্রায় দিনই তোমাকে ঠোঁট নাড়তে দেখি। তুমি কি মনে মনে কিছু বলো?'

পিপলু মনে মনে ছড়া বানায়। কিন্তু এটা জামসেদ স্যারকে বলা ঠিক হবে না। সে চুপ করে থাকল।

সেদিন স্কুল ছুটির সময় পিপলুকে হেডস্যার ডেকে পাঠালেন। পিপলু ভয়ে ভয়ে হেডস্যারের রুমে গেল।

হেডস্যার বললেন, 'আগামীকাল তোমার বাবাকে আসতে বলবে।'

'আমার বাবার তো অফিস আছে।'

'আচ্ছা, তিনি যেদিন পারেন সেদিনই আসবেন।'

কয়েকদিন পরে পিপলুর বাবা এসে হেডস্যারের সাথে দেখা করলেন। হেডস্যার বললেন, 'কী বলব আপনাকে! আপনার ছেলে তো মোটেই ক্লাসে মনোযোগী নয়। ওর রেজাল্টও ভালো হচ্ছে না। ক্লাসে বিড়বিড় করে কী যেন বলে। ওকে ডাক্তার দেখান।'

বাবা স্কুল থেকে বাড়িতে এসে পিপলুকে বললেন, 'তুমি ক্লাসে বিড়বিড় করে কথা বলো কেন?'

পিপলু কিছু না বলে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। বাবা ধমক দিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার? কথা বলছ না কেন? কী বলো বিড়বিড় করে?'

পিপলু তবু চুপ করে রইল। বাবা হয়ত আরো কথা বলতেন। কিন্তু মা এসে পিপলুকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'এইটুকু ছেলেকে বকাঝকা করছ কেন? বিড়বিড় করা দোষের নাকি?'

পিপলু অবশ্য এইটুকু ছেলে না। এই জানুয়ারি মাসে ক্লাস ফাইভে উঠেছে। তবু সে বুঝতে পারে, মা-বাবার চোখে সে ছোটো।

এই ঘটনার পর পিপলুর মা পিপলুর বড়ো মামাকে ডেকে পাঠালেন। পরদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে বড়ো মামা এলেন। পিপলুর মামার অনেক বুদ্ধি। তিনি কী করেন, পিপলু ঠিক বুঝতে পারে না। তবে মামা এলে পিপলুর অনেক ভালো লাগে।

মামা এসে পিপলুর সাথে অনেকক্ষণ ধরে দাবা খেললেন। কেন এসেছেন কিছুই বললেন না। শুধু যাওয়ার আগে পিপলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জানো পিপলু, আমাদের প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুজন আমি বাস করে।'

'দুজন আমি!' পিপলু চমকে ওঠে।

'হ্যাঁ, দুজন আমি। সেই দ্বিতীয় আমি সবকিছু পারে। যা তুমি ভাবছ কঠিন, দ্বিতীয় আমির কাছে তা সহজ।'

'সেই আমিকে দেখা যায়?'

'দেখতে চাইলেই দেখা যায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সাথে নিজে কথা বলে দেখো। সেই দ্বিতীয় আমি বের হয়ে আসবে।'

বড়ো মামার কথা শুনে পিপলুর অবাক লাগল। সত্যিই কি আমাদের মধ্যে আরেকজন আমি বাস করে? তাকে কি আয়নার সামনে দেখা যায়? আমি যা পারি না, সে কি তা পারে?

বড়ো মামা চলে যাওয়ার পর পিপলু গিয়ে দাঁড়ালো মায়ের ড্রেসিং টেবিলের সামনে। তারপর আয়নায় নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার নাম কী?'

আয়নার পিপলু বলল, 'আমার নাম টিপলু।'

পিপলু হেসে বলল, 'টিপলু কারো নাম হয় নাকি?'

আয়নার পিপলু মানে টিপলু এবার হাসল। তারপর বলল, 'কেন হবে না? কারো নাম যদি পিপলু হতে পারে, তবে টিপলুও হতে পারে।'

পিপলু বলল, 'আচ্ছা টিপলু, তুমি কি ছড়া বানাতে পারো?'

টিপলু হেসে বলল, 'বা রে! সবাই সবকিছু পারে নাকি?'

পিপলু বলল, 'তার মানে তুমি ছড়া বানাতে পারো না। তাহলে তুমি কী পারো?'

টিপলু বলল, 'আমি বাংলা পড়তে পারি, অঙ্ক করতে পারি, বিজ্ঞান বুঝতে পারি।'

পিপলু বলল, 'বাহ্, দারুণ তো। আমি যদি তুমি হতাম, তবে খুব ভালো হতো। আমার স্কুলের পড়া ভালো লাগে না।'

টিপলু বলল, 'এক কাজ করি। আমি আয়না থেকে বেরিয়ে এসে তোমার মধ্যে ঢুকে যাই। তাহলে তুমি বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজি সব করতে পারবে।'

টিপলু বলল, 'তাহলে তো দারুণ হয়!' তারপর মন খারাপ করে বলল, 'কিন্তু আমার যে ছড়া লিখতে ভালো লাগে। সেটার কী হবে?'

‘এটা কোনো সমস্যাই না। ছড়া লিখতে ইচ্ছা করলে আমি তোমার ভিতর থেকে বের হয়ে আসব।’ এটা বলে টিপলু পিপলুর মধ্যে ঢুকে গেল।

পরদিন পিপলু স্কুলে যাওয়ার পর দেখল, স্কুলের পড়া তার ভালো লাগছে। বাংলা পড়তে ভালো লাগছে। অঙ্ক করতে ভালো লাগছে। বিজ্ঞান বুঝতে ভালো লাগছে। আর স্যারদের পড়াও মজা লাগছে।

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় পিপলু সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রথম হয়ে গেল। জামসেদ স্যারও অবাক হয়ে গেলেন। স্কুলের হেডস্যার পিপলুর বাবাকে আবার ডাকিয়ে আনলেন। বললেন, ‘পিপলু তো অনেক ভালো রেজাল্ট করেছে! আমরা পিপলুকে নিয়ে গর্বিত।’

বাড়িতে ফিরে পিপলুর বাবা পিপলুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, ‘এত ভালো রেজাল্ট কী করে করলে পিপলু?’

পিপলু চুপ করে থাকল। বাবাকে বলল না তার ভিতরে টিপলু থাকে। এটা বললে অন্যরা বিশ্বাসও করবে না।

মা সেদিন ভালো রান্না করলেন। বড়ো মামাকে খবর দিলেন।

বড়ো মামা সন্ধ্যায় এলেন। এসেই পিপলুর সাথে দাবা খেলতে বসে গেলেন। তারপর রাতের খাবার খেয়ে চলে গেলেন।

মামা চলে যাওয়ার পর পিপলু আবার মায়ের ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তখন মনে হলো, তার ভিতর থেকে টিপলু আয়নার ভিতরে চলে গেল। পিপলু বলল, ‘টিপলু, তুমি কি চলে যাচ্ছ?’

টিপলু আয়নার ভিতর থেকে বলল, ‘হ্যাঁ, এখন তোমার ছড়া লেখার সময়। আমি আপাতত যাচ্ছি। আবার যখন পড়ার সময় হবে, তখন আমাকে ডেকো। আমি চলে আসব।’ ❐

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কবিতা

মেঘ বালিকা

মমতা মজুমদার

মেঘ বালিকা মেঘ বালিকা
কোথায় তোমার বাড়ি?
ঝুমঝুমিয়ে আসলে তুমি
দেবো না আর আড়ি!

টিনের চালে পড়লে হঠাৎ
লাগে ভীষণ ভালো,
তোমার সাথে করলে খেলা
ঘুচে সকল কালো।

টিয়াপাখির ছানা দুটো
আমার প্রিয় সাথি,
তুমিও হলে ভীষণ আপন
আনন্দে তাই মাতি।

ছোট্ট ময়না শালিক হলো
আমার প্রিয় সই,
তুমি এলে সবাই মিলে
করব যে হইচই।

মেঘের সাথে কথা হবে
তোমায় নিয়ে খুব,
আমরা সবাই যেমন সুখে
জলে খেলি ডুব।

উঠোন জুড়ে ঘুরে ঘুরে
বৃষ্টিরই গান গাও
আচ্ছা তুমি! কী গো বলো
কোথায় তোমার নাও?

আষাঢ় এলে

সাঈদুর রহমান লিটন

আষাঢ় এলেই ভালো লাগে
ঝমঝমাঝম বৃষ্টি,
কী দারুণ এর সুর লহরি
বিধাতার সৃষ্টি।

আষাঢ় এলেই মন ভরে যায়
নদী ভরা পানি,
গোসল করতে শিশু-কিশোর
করে টানাটানি।

আষাঢ় এলেই রূপ বেড়ে যায়
নানান রূপে সাজে,
চাষিরা সব গান গেয়ে যায়
বৃষ্টি মাথায় কাজে।

আষাঢ় এলেই জেলেরা সব
খুশির নাচন নাচে
আষাঢ় মাসের মাছের টাকায়
সারা বছর বাঁচে।

ভ্রমণ কাহিনি

পাহাড়ের রানি দার্জিলিং

ডালিয়া ইয়াসমিন

আকাশের কত রঙ তা পাহাড়ের রানি দার্জিলিং না ঘুরলে বুঝতাম না। স্বচ্ছ নীলাকাশ, হঠাৎ পাহাড়ের কোলে মেঘের আনাগোনা, চলতে চলতে মেঘের ছুঁয়ে যাওয়া, আবার ঝুম বৃষ্টি! প্রকৃতির কী অপূর্ব খেলা! ব্রিটিশ শাসনামল থেকে দার্জিলিংকে অবকাশযাপনের আদর্শ স্থান মনে করা হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর মনোরম আবহাওয়ার কারণে দার্জিলিং ব্রিটিশদের কাছে জনপ্রিয় ছিল। এজন্য প্রাদেশিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দার্জিলিং ছিল ব্রিটিশদের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। দার্জিলিং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৭,১০০ ফুট উচ্চতায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত শহরটিতে সারাবছর ঠান্ডা থাকে।

মেঘের স্বর্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত দার্জিলিংয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার জন্য এক ঘন বর্ষায় বেরিয়ে পড়লাম। যদিও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাবো কিনা তা নিয়ে ছিল শঙ্কা। মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেনে ঢাকা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি, সেখান থেকে গাড়িতে কার্সিয়াং হয়ে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সমতল ভূমি থেকে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে গাড়ি শুধু উপরে উঠছে। যেহেতু বর্ষাকাল– বৃষ্টি যে আমাদের নিত্যসঙ্গী হবে তা জেনেই বের হয়েছি। যত উপরে উঠছি পাহাড়ের কোলে থরে থরে সাজানো বাড়িঘর তত নিচে নামছে। পাহাড়ি রাস্তার এপাশে ওপাশে অসংখ্য ঝরনা। বর্ষার সুবাধে সুপ্ত ঝরনাও তার সৌন্দর্য মেলে ধরেছে। বড়ো ঝরনার

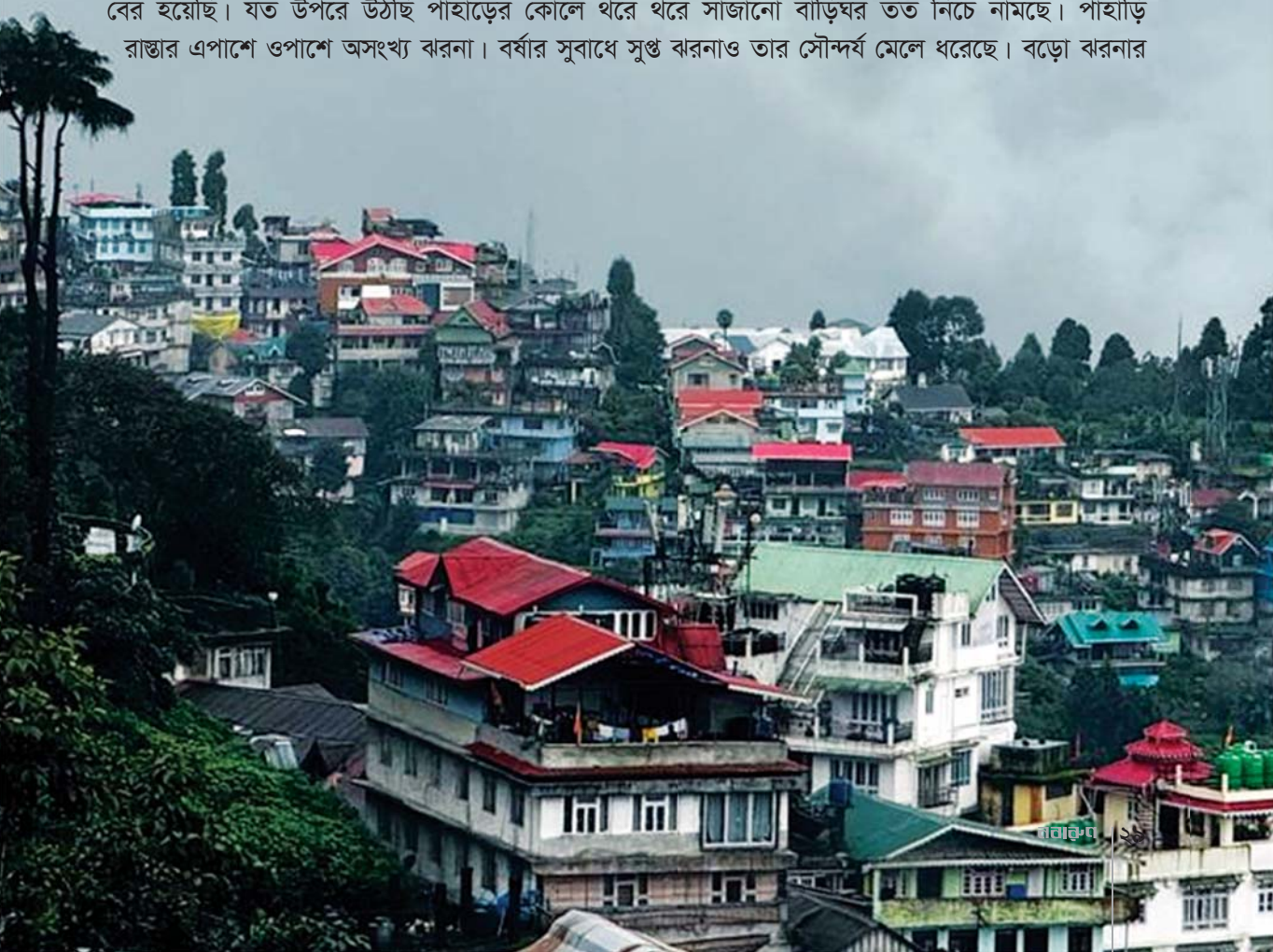

গর্জন ধ্বনি দূর থেকে শোনা যায়। মেঘের ভেতর দিয়ে কতক্ষণ গাড়ি চলছে জানা নেই। উপরে উঠতে উঠতে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম দার্জিলিং।

প্রথমদিন ভ্রমণের তালিকায় ছিল পিস প্যাগোডা, জাপানিজ টেম্পল, দার্জিলিং জুওলজিক্যাল পার্ক এবং টয় ট্রেনে ঘোরা। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজখ্যাত টয় ট্রেনে ঘোরার রোমাঞ্চকর অনুভূতি আজীবন মনে থাকবে। কয়লায় চালিত টয় ট্রেন তার হুইসেল বাজিয়ে শহরের অলিগলি দিয়ে পাহাড়ি পথ অতিক্রম করছে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেল স্টেশন থেকে দুই ঘণ্টার ট্রেন ভ্রমণে বাতাসিয়া লুপ ও ঘুম স্টেশনে কিছু সময়ের যাত্রা বিরতি ছিল। পৃথিবীর উচ্চতম রেলস্টেশন 'ঘুম'। সবসময় মেঘের চাদর গায়ে জড়িয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন 'ঘুম' নিঃশব্দে পাহাড় প্রেমীদের আকৃষ্ট করছে। পাহাড়ের রানি কাঞ্চনজঙ্ঘার সে স্নেহধন্য। ঘুমকে ছুঁয়ে দেখার অভিলাষ ছিল আমার এক সুপ্ত স্বপ্ন।

পাহাড়ের উপরে অবস্থিত সবুজ পাইনবনে আবৃত শুভ্র পিস প্যাগোডা সত্যি মনে প্রশান্তি এনে দেয়। পিস প্যাগোডা থেকে দুরন্ত মেঘ বালিকার ছুটে চলা দেখা যায়। দার্জিলিং জুওলজিক্যাল পার্কে ভাল্লুক, হায়েনা, রেড পাণ্ডাসহ অধিকাংশ প্রাণী মুক্ত পরিবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে খুব অবাক হলাম। বন্যপ্রাণী যে পরিবেশে থাকে সেটাই নিশ্চিত করা হয়েছে। অনেক দুর্লভ প্রাণীর সংরক্ষণ রয়েছে এখানে। স্নো লিওপার্ড, রেড পাণ্ডা এর মধ্যে অন্যতম। পরিচ্ছন্ন সবুজে আবৃত এ পার্কে এক অলস বিকেল নির্দ্বিধায় কাটিয়ে দেয়া যায়।

চায়ের দেশ দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে রয়েছে অসংখ্য চা বাগান। নারী শ্রমিকরা সেখানে একনিষ্ঠ চিত্তে চা তোলায় ব্যস্ত। রোপওয়ে থেকে ক্যাবল কারে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যাওয়ার সময় উপর থেকে তাদের কর্মব্যস্ত জীবন চোখে পড়ছিল। খুব অবাক হয়ে ক্যাবল কার থেকে পাহাড়ি জীবনযাত্রা লক্ষ করছিলাম।

এক একটা উঁচু পাহাড়ে আবার ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ মূর্তি, ক্ষণে ক্ষণে মেঘে ঢাকা বুদ্ধ দেবতা যেন পরম শান্তির বার্তা নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় বসে আছে।

দার্জিলিং থেকে বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। তবে বর্ষাকালে সাধারণত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় না। কিন্তু সারারাত ঝুম বৃষ্টির পর এক ঝলমলে রৌদ্রজ্জ্বল সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা দিল তার অপার্থিব সৌন্দর্য নিয়ে। দিগন্তবিস্তৃত সুউচ্চ পাহাড়, তার উপর শুভ্র মেঘরাজি, এর উপর কাঞ্চনজঙ্ঘা। কী তার বিশালতা! কী অপরূপ তার সৌন্দর্য ! ছোটো থেকে দেখে এসেছি মেঘ ওপর থেকে নিচে নামে আর এখানে দেখলাম মেঘ নিচ থেকে ওপরে ওঠে। এই মেঘেদের দল আবার কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে পরম মমতায় লেপ্টে আছে, যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার পরশে সে ধন্য।

পুরো দার্জিলিং শহরটাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষণা করলে কোনো অংশে ভুল হবে না। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মধ্যে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল স্টেশন, ঘুম স্টেশন,

টয় ট্রেন, দার্জিলিং সেন্ট্রাল ডাকঘর, রাজভবন, মাউন্টেনিয়াস ক্লাব অন্তর্ভুক্ত। ম্যাল রোডে অবস্থিত অনেক দোকানের স্থাপিত সাল দেখে খুব অবাক হয়েছি। সব ব্রিটিশ আমলে নির্মিত। এত পুরাতন সব স্থাপনা কী সুন্দর করে তারা সংরক্ষণ করেছে তা না দেখলে বোঝা যাবে না। ১৮৮৫ সালে নির্মিত দোকান Hope Glenary's এবং Keventer's এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায়ের মতো প্রোথিতযশা ব্যক্তিত্বরা আসতেন। সেখানে বসে এক কাপ কফি- সে এক অসাধারণ অনুভূতি। ম্যাল রোড, নেহেরু রোড, লোয়ার ক্লাব রোডে মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের পদচারণায় একসময় মুখরিত ছিল।

ছোটোবেলায় শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, শিয়ালদাহ, হাওড়া, হলদিবাড়ি, কলকাতা, ট্রাম এর বর্ণনা সমরেশ, সুনীল, শীর্ষেন্দুর লেখায় কত যে পড়েছি। কল্পনার রাজ্যে কাটানো সেই স্মৃতিগুলো বারবার মানসপটে ভেসে উঠছিল। কত কবিতা, কত গান,কত উপন্যাসে যে পড়েছি এসব জায়গার কথা। সেই স্বপ্নের জায়গায় নিজেকে দেখা সত্যি স্বপ্নের মতো। ❐

সিনিয়র সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ

বর্ষার মোহনীয় রূপ

শাহানা আফরোজ

ষড়ঋতুর এই দেশে গ্রীষ্মের পরই বর্ষা আসে থইথই জল-জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে। মাঠ-ঘাট, নদ-নদী, খাল-বিল সবখানেই যেন জলেরই উল্লাস, জলেরই খেলা। জলবতী মেঘের বাতাসে বর্ষা তার স্নিগ্ধ -সজল রূপ নিয়ে আসে। প্রাণ ফিরে পায় বাংলার প্রকৃতি। টিনের চালে বৃষ্টির মিষ্টিমাখা সুরে উদাস হয় মন।

আষাঢ় ও শ্রাবণ-এ দু'মাস বর্ষাকাল। তবে এর ব্যাপ্তি আরো বিস্তৃত। গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহ আর প্রখর রোদের পর ঘন গৌরবে নব উদ্যোমে আসে বর্ষা। ঝুম বৃষ্টিতে একসময় ক্ষেত-পাথার ডুবে যায়। থৈ থৈ পানি চারিদিকে। যেন নতুন সমুদ্র জাগে গ্রামজুড়ে। কলার ভেলায় চড়ে আনন্দে মেতে ওঠে দুরন্ত কিশোরের দল। ঝাঁপ দেয় পানিতে, ডুব সাঁতারে হার মানায় পানকৌড়িকেও। কেউ কেউ গাছে চড়ে লাফ দেয় দিঘির পানিতে। চারিদিকে অথই পানির ঢেউয়ের তালে তালে এগিয়ে চলে বাইচের খেলা।

গ্রামের পথঘাটে, কৃষকের ক্ষেতে কিংবা মাঠে গ্রামে শিশু-কিশোররা কাদা মেখে ফুটবল খেলায় মেতে ওঠে। । পশুপাখির মধ্যে কোনো চঞ্চলতা দেখা যায় না। তারা চোখ বন্ধ করে গাছের ডালে বৃষ্টিবিলাসে মত্ত থাকে। আকাশভাঙা বারিধারায় কানায় কানায় ভরে ওঠে নদ-নদী, পুকুর-নালা, হাওর-বাঁওড়সহ ছোটো-বড়ো জলাশয়। মনের সুখে ডাকে ব্যাঙ। এ সময় ঘরে বসে বৌ-ঝি দের সুঁচ আর হাতের জাদুতে হেসে ওঠে সুন্দর সুন্দর নকশিকাঁথা। ঘরের দাওয়ায় বসে বৃষ্টির ঝরে পড়া দেখতে বেশ ভালোই লাগে। এক যুগ আগেও এ সময় নানি-দাদিরা গল্পের ঝুলি খুলে শোনাতেন নাতি- নাতনিদের। রূপকথার রাজ্য, দৈত্য-দানব-ডাইনি বুড়ি আর রাক্ষসের গল্প। আজ সেই গল্পের ঝুলি হারিয়ে গেছে কালের গহবরে।

বর্ষার মাঠে সবুজ ফসল দুলতে থাকে আর বর্ষার রূপ কীর্তন গাইতে থাকে। খাল-বিলে শাপলা ফুটে হাসতে থাকে। ছোটো ছেলেমেয়েরা শালুক আর শাপলা তুলে নৌকায়। উদাস করা পল্লীবধূ নৌকায় বাপের বাড়ি নাইয়র যায়। আর ফিরে ফিরে চায় ফেলে আসা পথ পানে। পাল তোলা নৌকা কল কল করে চলতে থাকে মাঝির গানের সুরে।

বর্ষার গাঢ় সবুজের সঙ্গে পাল্লা হেসে দিয়ে ওঠে, কদম, কেয়া, কলাবতী, পদ্ম, দোলনচাঁপা, সোনাপাতি (চন্দ্রপ্রভা), ঘাসফুল, পানাফুল, কলমী ফুল। বর্ষার কোমলতা মানুষের হৃদয়কে যতটা ছুঁয়ে যায় বাংলার আর কোনো ঋতু এভাবে ছুঁতে পারে না। তাই বর্ষা বাংলার অনন্য ঋতু।

আমাদের সংস্কৃতির সাথে বর্ষা ঋতু ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। ধূলিময়, রুক্ষ-শুষ্ক প্রকৃতিকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিতে বর্ষার জুড়ি নেই। কবিদের কল্পনায় বর্ষা এক অনিন্দ্য সুন্দর সৃষ্টি। বর্ষা প্রকৃতিকে পূর্ণ করে সারা বছরের জন্য।

কবিতা

বৃষ্টি হলে

রাফিয়া আদনীন

আকাশ জুড়ে কালো মেঘ
ঝমঝম বৃষ্টি
মাঠ- ঘাট থই থই
উদাসী দৃষ্টি

বরষা এলে বাতাসে ভাসে
কদম ফুলের গন্ধ,
মনের মাঝে টুং টাং বাজে
কবিতার ছন্দ

বর্ষা এলে বৃষ্টি নামে
শান্ত নদীর কুল
ব্যাঙের দলের ডাকাডাকি
হয় না কোনো ভুল।

অষ্টম শ্রেণি, কদমতলা হাই স্কুল, বাসাবো

আষাঢ় - শ্রাবণ

মারুফ বিল্লাহ

বর্ষাকাল হয় আষাঢ় ও শ্রাবণে
গ্রাম বাংলা ভেসে যায় প্লাবনে
মাঠ-ঘাট, বিল-ঝিল পূর্ণ পানিতে
গ্রীষ্মের খরতাপ মুক্তি বৃষ্টিতে।

ঝুম বৃষ্টিতে চারিদিক জনমানব শূন্য
ফোঁটায় ফোঁটায় প্রকৃতি হয় ধন্য
ভেসে যায় সবকিছু বর্ষাকালের জন্য
খাল-বিল, নদী-নালা পানিতে হয় পরিপূর্ণ।

দ্বাদশ শ্রেণি, চন্দ্রনাথ কলেজ, নেত্রকোণা

elvi d‡ji nvwm

শাহানাজ সুলতানা

বর্ষার আকাশ মানেই মেঘের ঘনঘটা। আকাশটা যেন ফরসা হতেই চায় না। শুরু হয় দিনরাত বৃষ্টির দৌড়ঝাঁপ। এ সময় গাছে গাছে সবুজ পাতার আড়ালে ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ মোহময় করে তোলে আমাদের চারপাশ। প্রকৃতি গ্রীষ্মের তাপদাহের প্রখরতার পর নতুন করে রানির মতো সাজতে থাকে। তাই বর্ষাকে বলা হয় প্রকৃতির রানি।

বর্ষা মানে বাহারি রঙের সুগন্ধি ফুলের সমাহার। এ সময় যে ফুলগুলো আমাদের আকৃষ্ট করে তা হলো–শাপলা, কদম, কেয়া, কলাবতী, পদ্ম, দোলনচাঁপা, সোনাপাতি (চন্দ্রপ্রভা), বেলি, জুঁই, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, টগর, সাদা কাঠ গোলাপ, কলমিফুল, কামিনী, রঙ্গন, অলকানন্দ, বকুল এছাড়াও নানা রঙের অর্কিড।

বর্ষায় যত ফুল ফোটে তার মধ্যে বেশি ফুটে সাদা ফুল। সাদা ফুল ফোটে রাতে, সুগন্ধে জানিয়ে দেয় ওরা এসেছে। রাতে কেন সাদা ফুলেরা ফোটে, তাতে আছে এক রহস্য! ফুলের পরাগায়ণের জন্য আকৃষ্ট করতে হয় পতঙ্গদের। রাতের রঙিন ফুল পতঙ্গদের চোখ পড়ে না, ওরা দেখতে পায় সাদা ফুল। সৌরভই পতঙ্গদের ফুলের কাছে নিয়ে আসে। নিশাচর পতঙ্গেরা এসব ফুলের পরাগায়ণ ঘটায়।

বর্ষা মানেই কদম ফুল। বর্ষার শুরুতেই মিলবে কদমের সৌরভ। কদম ফুল প্রকৃতিতে এনে দেয় নজর কাড়া সৌন্দর্য। গ্রামের নদীর তীরে, খোলা প্রান্তরে কদম গাছ চোখে পড়ে। এছাড়া শহরে দেখা মেলে পার্কে ও উদ্যানে। কদম ফুলের আদি নিবাস ভারত, চীন ও মালয়।

এরপর ফুটতে শুরু করে রজনীগন্ধা, মালতিলতা, জুঁই ও কেয়া। ভরা বাদল দিনে স্বর্ণচাঁপা কিংবা দোলনচাঁপা বাতাসে সুগন্ধি ছড়িয়ে দেয়। এমন বৃষ্টির দিনে পাওয়া যায় বেলি ও বকুলের সৌরভ। বকুল ফুল শুকিয়ে গেলেও এর সুবাস থাকে অনেকদিন। তাই একে বলা হয় সুবাসিত ফুল। পাঁচ বৃন্তের এ ফুলে পাপড়ি থাকে অসংখ্য ।

বর্ষার ফুলের মধ্যে অসাধারণ দুটি ফুল হলো জুঁই ও মালতি। কবি ভাষায়– 'শ্রাবণ বেলা বাদল ঝরা/ যূথি বনের গন্ধে ভরা'। ঘন সবুজ পাতার ভিড়ে থোকা থোকা জুঁই ফুলের ঘ্রাণ বাদল দিনের পরম উপহার। বাদল বাতাস মেতে উঠে মালতির গন্ধেও।

এ সময়ের আরেকটি ফুল ফুরুস। ইংরেজি নাম ক্র্যাবফ্লাওয়ার। গন্ধহীন সাদা, গোলাপি বা বেগুনি

রঙের ফুলটি শহরের নানা জায়গায় চোখে পড়ে। অনেকেই একে চেরি বলে ভুল করে। বর্ষার আকর্ষণীয় ফুল দোপাটি। গোলাপি, লাল, বেগুনি, আকাশি, নীল ও সাদাসহ কয়েক রঙের দোপাটি রয়েছে। দোপাটি একক অথবা জোড়ায় জোড়ায় ফুটতে দেখা যায়। এ সময় পানির মাঝে উঁকি দেয় বেগুনি রঙা কলমি ফুলও।

বৃষ্টিস্নাত সবুজ পাতার ফাঁকে দেখা মিলে দোলন চাঁপা, টাইগার লিলি, বহু রঙা গ্লোরি লিলি, ঘাস ফুল, কলাবতী ও অলকানন্দা।

বর্ষার আগমনেই দেখা যায় শাপলা-শালুক-পদ্ম। বিল-পুকুর ও জলাশয়ে শাপলা ফুল গ্রাম-বাংলার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে। সাদা, গাঢ় লাল, নীল ও গোলাপি রঙের শাপলা বেশি দেখা যায়। এখন দেশের বিভিন্ন বিলে পদ্মও দেখা যায়। গোলাপি রঙের পদ্ম বেশি দেখা গেলেও সাদা রঙের পদ্মও মাঝে মধ্যে দেখা যায়। সাদা দুধের মতো পাপড়ির রং।

প্রকৃতির নান্দনিক আরেক সৌন্দর্য কচুরিপানা ফুল। গ্রামাঞ্চলে খাল, বিল, পুকুর ও জলাশয়ে হালকা বেগুনি রঙের কচুরিপানা ফুলগুলো দেখতে দারুণ লাগে। ফুলগুলো সাধারণ কিন্তু মুগ্ধতা অসাধারণ। ❐

শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

e„ó‡dvUv bvg‡e wb‡P

শাকিব হুসাইন

ছোট্ট একটা বৃষ্টিফোঁটা। নরম তুলতুলে তার মন। কিন্তু কেন জানি বৃষ্টিফোঁটার মনটা ভালো নেই। এত্তটুকুও নেই। বেশকিছুদিন ধরেই বৃষ্টিফোঁটাটা গোমড়ামুখো হয়ে আছে। কিন্তু কেন? অমন গোমড়ামুখো মুখটা দেখতে কার ভালো লাগে? না থাক, তোমরা উত্তরটা পরে দিও। আজকে বরং তোমাদের বৃষ্টিফোঁটার গোমড়ামুখো থাকার কারণটা বলি কেমন! তাহলে মন দিয়ে শুনো তো...

ছোট্ট বৃষ্টিফোঁটাটা আকাশ থেকে নিচে নামতে চায়। কোনোভাবেই তা পারছে না। কেমন করেইবা নামবে! আকাশবুড়ো তো কাঁদেই না। আকাশবুড়ো যতক্ষণ না কেঁদে দেয় ততক্ষণ তো তাকে আকাশে থাকতেই হবে।

একদিন বৃষ্টিফোঁটা আকাশবুড়োকে ডেকে বলল- ও আকাশবুড়ো, আকাশবুড়ো কতদিন হয়ে গেল, তুমি একটুকুও কান্না করো না। একটু কান্না করে দাও না আকাশবুড়ো?

আকাশবুড়ো মুচকি হেসে বলে- ওরে বোকা সময় আসুক। তখন না হয় কাঁদব।

কখন সেই সময় হবে আকাশবুড়ো? আমি যে নিচে নামতে চাই। সবুজ সবুজ ঘাসগুলোতে নাচানাচি করতে চাই। আচ্ছা, আকাশবুড়ো একটা কথা বলব?

বল দেখি বাপু। শুনি তোর কথাখানি।

আচ্ছা আকাশবুড়ো, মানুষেরা যে এত্ত এত্ত রকেট তোমার গা ফুটো করে পাঠাচ্ছে তাতে তোমার একটুকুও ব্যথা করে না?

ওরে বোকা আমি কি ওদের মতো রক্তমাংসে গড়া নাকি রে?

তাও তো ঠিক। তার মানে তোমার ব্যথা লাগে না। আর তুমি কাঁদবেও না। আমার আর নিচে যাওয়া হবে না।

বেশকিছুদিন পর। হঠাৎ করেই আকাশবুড়ো ডাকাডাকি শুরু করে দিল। সে কী তোলপাড় রে বাবা! দুড়ুমদুড়ুম দুড়ড়ড়ড়ড়ুম!

আকাশবুড়ো বৃষ্টিফোঁটাকে ডেকে বলে- কই রে বৃষ্টিফোঁটা? আজকে আমার কাঁদার সময় হয়েছে রে। তুই এবার নিচে নামতে পারবি। তুই প্রস্তুত আছিস তো?

বৃষ্টিফোঁটা আনন্দে চেঁচিয়ে বলে উঠল- আমি প্রস্তুত গো আকাশবুড়ো। তুমি শুধু কান্নাটা জুড়েই দাও। তারপর দেখো আমার নাচানাচি!

আকাশবুড়ো কাঁদতে শুরু করল। সে কী কান্না রে বাবা! ঝমঝম ঝমঝম! টপটপ টপটপ! একটুও থামার নাম নেই। ততক্ষণে বৃষ্টিফোঁটা নিচে নেমে গেছে। আকাশ থেকে টুপ করে পড়ে ঘাস মাসির মাথায়।

ঘাস মাসি চেঁচিয়ে বলে উঠল- ও বাবা গো! কে পড়লি রে আমার মাথায়?

আমি গো মাসি আমি বৃষ্টিফোঁটা।

ওকি! বৃষ্টিফোঁটা যে। তা এতদিন পর এলি বাপু। কেমন আছিস রে?

ভালো আছি ঘাস মাসি। তোমাদের কাছে এসে আরও বেশি ভালো লাগছে। যাই গো মাসি একটু ঘুরে আসি।

এই বলে বৃষ্টিফোঁটা অন্য বৃষ্টিফোঁটাদের সাথে গড়াতে থাকল। সে কী আনন্দ হচ্ছে! গড়াতে গড়াতে একসময় একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। গর্ত থেকে আর উঠতে পারে না। ভীষণ ভয় করছে বৃষ্টিফোঁটার। গর্ত থেকে উপরে উঠতে চায় সে। ওই যে এত্ত দূরের আকাশবুড়োর কাছে। চিৎকার করে আকাশবুড়োকে ডাকে। কিন্তু তার ডাক আকাশবুড়োর কান অব্দি পৌঁছালো না। পৌঁছাবেই বা কেমন করে? সে-তো খুব ছোটো। তা-ও আবার গর্তের মাঝে পরে আছে। ভীষণ ভয়ে ভয়ে দুদিন কেটে গেল বৃষ্টিফোঁটার।

দুদিন পর রোদ উঠল চকচক করে। ভীষণ রোদ। খালবিল শুকিয়ে গেল। খালবিলের বৃষ্টিফোঁটারা জলীয়বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে গেল। বৃষ্টিফোঁটা চেয়ে চেয়ে দেখছে। ছোট্ট বৃষ্টিফোঁটারও জলীয়বাষ্প হয়ে আকাশবুড়োর কাছে যেতে ইচ্ছে করে। মনে মনে বারবার আকাশবুড়োকে ডাকছে। ঠিক তখনই সে-ও জলীয়বাষ্প হয়ে গেল। আর উপরের দিকে উঠতে থাকল। বৃষ্টিফোঁটার খুশি আর দেখে কে! সে কী খুশি রে বাবা! ঝলমল চকচক করতে করতে বৃষ্টিফোঁটা উপরে উঠতে থাকল। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছ কোথায় যাচ্ছে বৃষ্টিফোঁটা। পারছ না? ও হ্যাঁ, বৃষ্টিফোঁটা যাচ্ছে ওই যে এত্ত দূরের আকাশবুড়োর কাছে... ❐

শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গল্প

তেঁতুল গাছে ভূত

নুরুল ইসলাম বাবুল

ভূতটা প্রতি রাতে আসে না। কয়েকরাত পর পর আসে। আজও এল। টের পেল জেসান। দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালো। রাত বারোটা বাজে। ভূতটা ঠিক এসময়ই আসে। জেসান পড়ে ক্লাস এইটে। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা। তাই অনেক রাত জেগে লেখাপড়া করে সে। পড়ার টেবিলের সামনেই জানালা।

জানালার একপাশ খোলা। সামনে তাকালেই দেখা যায় ওদের উঠোন। উঠোনের এক কোণে মস্ত বড়ো একটা তেঁতুলগাছ। ভূতটা ওই গাছের মগডালে এসে দাঁড়ায়। নাচানাচি করে। আজও এসেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচছে। জেসান জানালা দিয়ে দেখতে পেল সারা গায়ে জড়ানো সাদা কাপড়। ভূতটা নাচছে। জেসান ভয়ে জানালা বন্ধ করে দিল।

কিছু সময় চুপচাপ বসে রইল জেসান। তারপর বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টালো। পড়ালেখায় মন দিতে চাইল। কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারল না। বাইরে তেঁতুলগাছটার ডালপালা নড়ছে। বেশ শব্দ হচ্ছে তাতে। নিশ্চয়ই ভূতটা লাফালাফি করছে। জেসান জানালা খুলে দেখার চেষ্টা করল। দেখে অবাক হলো সে। আজ ভূত একটা নয়। দুই-দুইটা ভূত মগডালে দাঁড়িয়ে নাচানাচি করছে। নানারকম শব্দ করছে। ভয়ে আবারও জানালা বন্ধ করে দিল জেসান।

রাত গভীর হতে থাকল। পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে বাবা-মা। জেসানের ঘুম আসছে না।

কিছুক্ষণ হলো তেঁতুলগাছ থেকে কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হয়, ভূতগুলো নেচে নেচে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। জেসান ভাবল, একটু দেখি তো জানালা খুলে।

জানালা খোলার জন্য হাত বাড়ালো। সেই সময়ে ঠক করে শব্দ হলো। জানালার ওপাশেই। জেসান থমকে গেল। জড়োসড়ো হয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। অনেক সময় কেটে গেল। কিন্তু আর কোনো শব্দ শোনা গেল না।

ভূত আগেও এসেছে। নাচানাচি করেছে। জেসান দেখে ভয় পেয়েছে। কাঁথা জড়িয়ে শুয়ে পড়েছে। এক ঘুমে রাত শেষ হয়ে গেছে তার। কিন্তু আজ ঘুম আসছে না জেসানের। এই মুহূর্তে ভয়ও পাচ্ছে না। ভূতগুলোও যাচ্ছে না। একটু আগেই আবার নাচানাচি শুরু করেছে। ডালপালা ঝাঁকানোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

জেসান খুব সাহস করে জানালা খুলল। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে। পুরো তেঁতুলগাছটা দেখা গেল এবার। গাছের মাঝামাঝি উঁচু একটা

ডালে ভূতটা নাচছে। হঠাৎ জেসানের চোখ আটকে গেল তেঁতুলগাছটার গোড়ার দিকে। একেবারে গাছের গোড়ার দিকে কী যেন নড়াচড়া করছে। চোখ দুটো স্থির করে আরও ভালোভাবে দেখতে লাগল সে। একসময় জেসান অনুমান করল, তেঁতুলগাছের নিচে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। কখনো হাঁটাহাঁটি করছে। তারপর সে বুঝে গেল লোকটা তারই সমান। আরও কিছুসময় লক্ষ্য করার পর বুঝতে পারল, ওটা আসলে বিটলু। জেসানের সহপাঠী সে। তবে খুবই দুষ্ট। ঠিকভাবে পড়ালেখা করে না। জেসানের মাথায় একটা আইডিয়া এল।

জেসান বসে বসে আরও কিছুটা ভেবে নিল। তারপর পেছনের দরজা খুলে বাইরে বের হলো। বাড়ির ভেতরে আরেকটা ঘরে থাকে রাকিব। রাকিব ওর চাচাতো ভাই। একই ক্লাসে পড়ে। আস্তে আস্তে রাকিবকে ডাকল জেসান। রাকিব খুব তাড়াতাড়িই সাড়া দিল। জেসান ফিসফিস করে বলল, বাইরে আয়।

রাকিব ঘুমে কাতর হয়ে বলল, কেন, কী হয়েছে?

জেসান তাড়া দিয়ে বলল, আগে বের হয়ে আয়, তারপর সব বলছি।

রাকিব ধীর পায়ে বের হলো। কোনো শব্দ হলো না। তারপর জেসানের কাছাকাছি হয়ে বলল, কী হয়েছে বল?

ঘটনা খুলে বলল জেসান। রাকিব নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবারও জানতে চাইল, গাছের নিচে বিটলু রয়েছে, এ ব্যাপারে তুই শিওর?

জেসান জোর গলায় বলল, হ্যাঁ, ওটা বিটলুই হবে।

জেসানের চেয়ে কিছুটা বড়ো রাকিব। শরীরের শক্তিও বেশি। সাহসও কম না। রাকিব জেসানকে অভয় দিয়ে বলল, তাহলে চল, ভূতের রহস্য বের করে ফেলি।

উঠোনের অন্যপাশে খড়ের পালা। প্রথমে পালার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা। তারপর যে পাশে দাঁড়ালে পুরো তেঁতুলগাছ দেখা যায়, সেই পাশে গেল। পরিষ্কার দেখা গেল, গাছের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে দুইজন। তাদের গায়ে জড়ানো সাদা কাপড়। নিচে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন। গায়ে কালো টি-শার্ট। রাকিব ভালোভাবে দেখে নিল। হ্যাঁ, গাছের নিচে বিটলু দাঁড়িয়ে আছে।

একটু পরে যা ঘটল, তা দেখে অবাক হয়ে গেল জেসান আর রাকিব। গাছের দুই ভূতের সাথে ফিসফিস করে কথা বলছে বিটলু। কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। রাকিব একটু-একটু করে এগিয়ে গেল। পেছনে জেসান।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই, বিটলুকে জাপটে ধরল রাকিব। জেসানের কাছে রশি রাখা ছিল। দুইজন মিলে গাছের সাথে বেঁধে ফেলল। রাকিব বিটলুর গলা চেপে ধরে বলল, বল, গাছের উপর কারা?

বিটলু দেরি না-করে ঝটপট বলে ফেলল, হাবিল আর জিহাদ। ওরাও জেসানের সহপাঠী। রাকিব চেঁচিয়ে উঠল, ওই ভূত নেমে আয়। তোদের আজ মজা বুঝাবো।

রাকিবের চেঁচামেচি শুনে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছেন জেসানের বাবা-মা। এসেছেন রাকিবের বড়ো ভাই। হাবিল আর জিহাদ গাছ থেকে নেমেই জেসানের বাবা-মায়ের পা ধরে বলল, আমাদের ভুল হয়েছে, মাফ করে দেন। গাছের সাথে বেঁধে রাখা বিটলুও বলল, আমরা আর এরকম করব না, মাফ করে দেন।

জেসান বাবাকে ঘটনা খুলে বলল। বাবা সবকিছু শুনে কিছুটা চিন্তিত হলেন। তারপর হাবিল, জিহাদ ও বিটলুকে বললেন, তোমরা এরকম করেছ কেন?

বিটলু কাতর কণ্ঠে বলল, আমি বলছি, আংকেল। তার আগে আমার বাঁধনটা খুলে দেন , প্লিজ। খুব কষ্ট হচ্ছে।

বড়ো ভাইয়ের নির্দেশে বিটলুর বাঁধন খুলে দিল রাকিব।

বিটলু মুক্ত হয়ে জেসানের বাবার সামনে গিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়ালো। তার মাথায় হাত রাখলেন জেসানের বাবা। তারপর অভয় দিয়ে বললেন, বলো বাবা, তোমরা এরকম করেছ কেন?

বিটলু বলল, উত্তরপাড়ার শফিক আমাদের এরকম করতে বলেছে। শফিক আমাদের ক্লাসেই পড়ে।

অবাক হলেন জেসানের বাবা। বললেন, শফিক তো

খুব ভালো ছেলে। সে এরকম করতে বলবে কেন?

বিটলু বলল, পরীক্ষায় প্রতি বছর জেসান ফার্স্ট হয়। শফিক একবারও হতে পারে না। সেজন্য জেসানের পড়ালেখায় ক্ষতি করার জন্য আমাদের ভূত সাজিয়ে পাঠায়। শফিক প্রতিদিন কোল্ড ড্রিংস দেয়, তাই আমরা এসে জেসানকে ভূতের ভয় দেখিয়ে পড়ালেখায় বিঘ্ন সৃষ্টি করি।

বিটলুর কথা শুনে রেগে আগুন হয়ে গেল রাকিব ও তার বড়ো ভাই। রাকিব কিল-ঘুষি মারতে গেল। বাধা দিলেন জেসানের মা।

তিনজন জেসানের বাবার পায়ে হাত রেখে বলল, আমাদের মাফ করে দেন। আমরা আর এরকম করব না। ওদের হাত ধরে দাঁড় করালেন জেসানের বাবা। বললেন, ঠিক আছে, তোমাদের মাফ করে দিলাম। আর শফিকের বাবা আমার বন্ধু। তার সাথে পরে এ ব্যাপারে আলাপ করা যাবে।

হাবিল, জিহাদ, বিটলু জেসানের কাছে গিয়েও মাফ চাইল। জেসানের মা ওদের কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, বাবারা শোনো, তোমরা অন্যের কথায় এতদিন শুধু জেসানের ক্ষতি করোনি, এতে তোমাদেরও ক্ষতি হয়েছে।

ওরা তিনজন একবাক্যে বলল, জি, খালাম্মা। আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি। আর এরকম হবে না।

রাকিব জেসানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, এবার মিটে গেল তেঁতুলগাছে ভূতের নাচন। জেসান হাসল। রাকিবও হাসল।

জেসানের বাবা বললেন, এবার তোমরা যার যার বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। আর মনে রেখো, সহপাঠী মানে বন্ধু। বন্ধু হয়ে বন্ধুর ক্ষতি করতে নেই। ❐

সহকারী শিক্ষক, বিলচান্দক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাবনা

সিরাজুম মুনিরা বিভা, প্রথম শ্রেণি, সিদ্ধেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

কবিতা

কদম ফুল

টুম্পা ইসলাম

টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে
মন করে দেয় ব্যাকুল
কী মায়ায় চেয়ে থাকে
প্রিয় কদম ফুল।

চমৎকার রূপের বাহার
গায়ে হলুদ শাড়ি
সেজে গুজে দেয় যে উঁকি
কদম ডালে তার বাড়ি।

অষ্টম শ্রেণি
মনিপুর হাই স্কুল, মিরপুর, ঢাকা

আবার এল বর্ষা

সুমাইয়া জান্নাত

আকাশ জুড়ে মেঘের ভেলা
প্রকৃতিতে নতুন সাজ
বছর ঘুরে সবার কাছে
বর্ষা এল আজ।

খাল বিল নদী নালা
যায় পানিতে ভরে
মনের আনন্দে জেলেরা
নানান রকম মাছ ধরে।

শাপলা ফুলে ছেঁয়ে যায়
সারা বিল জুড়ে
ছেলেরা সব কুড়িয়ে
নিয়ে আসে ঘরে।

নবম শ্রেণি
খিলগাঁও মডেল হাই স্কুল, ঢাকা

বৃষ্টি

নেহা ইসলাম

ঝমঝমিয়ে আকাশ থেকে
নামল সুখের বৃষ্টি
বৃষ্টি পড়ার শব্দ
আহা লাগে কত মিষ্টি।

হুড়মুড়িয়ে বইছে তুফান
সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া
বৃষ্টিতে যায় ভিজে
দক্ষিণের দাওয়া।

ঝড়ের বেগে গাছগুলো
পড়ছে মাথা নুয়ে
পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির ফোঁটা
হাত বাড়িয়ে দেই ছুঁয়ে।

একাদশ শ্রেণি
কুমিল্লা জিলা স্কুল, কুমিল্লা

আমার গল্প

আরাফ আজিজ

আমার নাম আরাফ। আমি ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। পড়ালেখার পাশাপাশি আমি কিছু পাখি পালন করি। যেমন: ডায়মন্ড ডাফ, বাজরিগার, কবুতর, কোয়েল। অবসর সময় আমি আমার পাখিদের সাথে কাটিয়ে দেই। বিকালে যখন আমি আমার কবুতরদের ছাদে ছেড়ে দেই তখন সবগুলো একসাথে আকাশে উড়ে বেড়ায় আর তারা একসাথে ডাকাডাকি করে, তখন আমার খুব ভালো লাগে। কয়েকদিন স্কুল বন্ধ থাকায় পাখি আর কবুতর আমার খেলার সাথি হয়ে উঠেছে। কবুতর ও পাখি যখন ডিম দেয় তখন আমি অনেক খুশি হই। আমি এদের খাওয়াই, গোসল করাই।

মন খারাপ থাকলে আমি ওদের সাথে খেলি তখন আমার মন ভালো হয়ে যায়। আমার দুটি পোষা কবুতর আছে যাদের আমি ছোটো থেকে বড়ো করেছি। ওদের নাম হলো: দুষ্টু আর মিষ্টি। ওরা আমার সবথেকে পছন্দের কবুতর। আমি যেখানে যাই তাদের দুজনকে নিয়ে যাই। আমরা একসাথে ঘুরাফেরা করি। এই ছিল আমার গল্প।

ষষ্ঠ শ্রেণি, মতিঝিল মডেল স্কুল, ঢাকা

বর্ষা এল

মো. মুশফিকুর রহমান

বর্ষা এল গ্রীষ্ম গেল
গরম গেল চলে
সূর্যি মামার তেজটাও কমল
হাওয়ার ভেলায় চরে।

বৃষ্টি এলে কদম ফুল
ছড়ায় মিষ্টি হাসি
টুপটাপ সেই পাতার ধ্বনি
আমরা ভালোবাসি।

দলে দলে সবাই মিলে
বৃষ্টিতে বেড়াই
বর্ষা এল বর্ষা এল
খুশির সীমা নাই।

একাদশ শ্রেণি, ডিএমআরসি কলেজ, ঢাকা

গাছ যেভাবে বৃষ্টি আনে

মেজবাউল হক

গাছের সাথে বৃষ্টির একটা সম্পর্ক আছে ঠিকই কিন্তু গাছ নিজেই সরাসরি বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারে না। তবে স্থানীয় জলবায়ুকে প্রভাবিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃষ্টি আছে বলেই এখনো পৃথিবীটা শস্য-শ্যামলায় পরিপূর্ণ । বৃষ্টি না থাকলে সমগ্র পৃথিবীটা মরুভূমিতে পরিণত হতো। পৃথিবীর বুকে বৃষ্টিপাত আমাদের জীবনে দারুণ আশীর্বাদ বয়ে আনে।

গাছ মূলত দুটি প্রক্রিয়ায় বৃষ্টি হতে সাহায্য করে থাকে। একটি হলো ইভাপোরেশন বা বাষ্পমোচন এবং অন্যটি হলো কনডেনসেশন বা ঘনীভবন। গাছ সূর্যালোকের সাহায্যে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতিতে, মাটি থেকে শিকড়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা পানির সাহায্যে খাদ্য তৈরি করে। গাছ মাটি থেকে যে পরিমাণ পানি গ্রহণ করে তার পুরোটা খাদ্য তৈরিতে প্রয়োজন হয় না, তখন সেই অপ্রয়োজনীয় পানিগুলো পাতার সাহায্যে জলীয় বাষ্প রূপে বাতাসে ছেড়ে দেয়। এতে বাতাসে ভাসমান জলীয় বাষ্প কণার পরিমাণ বেড়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গাছ নিজেকে ঠান্ডা করতে এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। যেমন ঘাম আমাদের শরীরকে শীতল করে ঠিক তেমনি । আর বাতাসে জলীয় বাষ্প বাড়ার সাথে সাথে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ে যা হলো বৃষ্টির প্রধান উপাদান। বাতাসে পানির পরিমাণ বাড়ার ফলে এলাকার তাপমাত্রা কমে যায়। এতে বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ভারী ও ধূলিকণার সাথে মিশে মেঘে পরিণত হয়। ভারী হতে হতে বাতাস আর মেঘ ধরে রাখতে পারে না। বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে ঝরে পড়ে। এভাবে গাছ বৃষ্টি বয়ে আনে। এজন্য মরুভূমি এলাকার থেকে বনভূমি এলাকায় বৃষ্টি বেশি হয়। তাই বলা যায় গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি স্থানীয় বৃষ্টিপাতের ধরনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

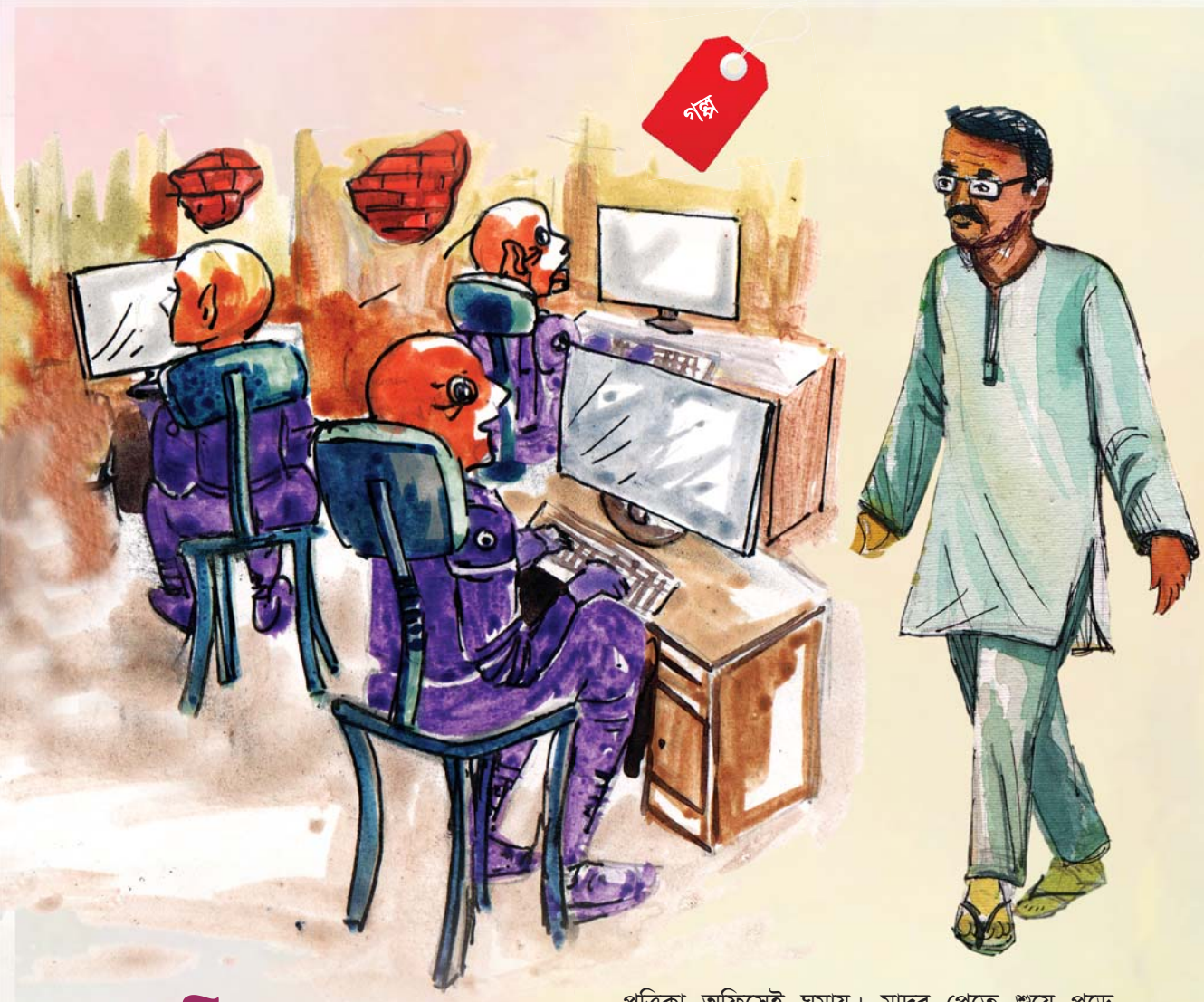

ভিন্ন জগতে

রহমাতুল্লাহ আল আরাবী

রতন মিয়া পত্রিকা অফিসে কাজ করে। তার ছোটোখাটো কাজ– চা বানানো, সম্পাদক সাহেবের জন্য টুকটাক কাজ করা, পত্রিকা বিলি করা ইত্যাদি। তার বয়স ৫২। ৫২ থেকে ১৬ বাদ দিলে থাকে ৩৬। ১৬ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল সে। যদিও পুরোটা দিতে পারেনি। এরপর গত ৩৬ বছর ধরে সে চাকরি করে আসছে পত্রিকায়। এ চাকরিটা অসম্ভব ভালো। দেশ-বিদেশের তরতাজা খবরের সাথে যুক্ত থাকা যায়। এ সৌভাগ্যই বা কজনের হয়? সে রাতে পত্রিকা অফিসেই ঘুমায়। মাদুর পেতে শুয়ে পড়ে চুপচাপ। মেসে বা আলাদা বাড়ি ভাড়া করেও থাকতে পারত। কিন্তু সে শৌখিন নয়। তাই একা মানুষ হওয়ায় তার কোনো বাড়ি বা মেসের দরকার হয় না।

আজ সকালবেলাটা যথেষ্ট ভালো যাবে বলে মনে হচ্ছে তার। ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়েই পত্রিকাগুলো নিয়ে বসে গেল। সব পাতার হেডলাইনের দিকে একবার করে চোখ বুলিয়ে নিলো সে। এবার তিন নাম্বার পাতাটা খুলল। 'আজকের দিনটা কেমন যাবে' শিরোনামটা পড়ে লেখাটা পড়া শুরু করল। তার ধনুরাশি। আজকের রাশিফলে লেখা–

ধনুরাশির জন্য যাত্রা শুভ। তবে কিঞ্চিত অর্থনাশের ও শত্রুপক্ষের কাছে সম্মানহানির আশঙ্কা রয়েছে।

এটুকু পড়েই খানিকটা চিন্তিত হলো রতন। সম্মান তো

কিছুই নেই। যা আছে তাও যদি চলে যায় তাহলে তো মুশকিল। পরের পাতা উলটাতে যাবে এমন সময় মফিজুর রহমান স্যারের ফোন এল। রতন মিয়া ফোনের রিসিভারটা তুলে কিছুক্ষণ কথা বলার পর 'জে আচ্ছা' বলে রেখে দিল। স্যার গতকাল যে কাগজটা দিয়েছিল তা লালমাটিয়ার ৪ নম্বর গলির বড়ো বাড়িতে দিয়ে আসতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে। প্রথমে বিকাশে ৫০ টাকা পেমেন্ট করে দিয়েছিল যাবার খরচ হিসেবে। কিন্তু পরে বলল স্যারের অফিসের গাড়িটা নিয়ে যেতে। রতন মিয়া রওনা হলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। রাস্তায় আজ কেন জানি ভীড় কম। ঢাকার রাস্তায় তো এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। পরক্ষণেই তার রাশিফলের কথা ভেবে চিন্তিত হলো সে। না টাকা তো আছে বিকাশে! বিকাশ থেকে চোর টাকা নিতে পারবে? সে সিস্টেম কি আছে? কী জানি!! রতন মিয়া সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই লিফটে উঠল।

লিফটে রতন একা। লিফটম্যান তাকে ঢুকিয়ে বোতাম টিপে দিয়ে বলল— আটতলায় গিয়ে থামবে। নেমে যাবেন। পারবেন না? রতন বলেছে, জে পারব। তার কথা শেষ হবার আগেই লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। লিফট চলছে না। স্থির হয়ে আছে। কী ব্যাপার, লিফটম্যান কি বোতাম টিপে দেয়নি? সে কি বোতাম টিপবে? রতন মনস্থির করতে পারছে না। হঠাৎ করে লিফটের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেল। ইলেকট্রিসিটি কি চলে গেল? রতনের বুকে ধক করে ধাক্কা লাগল। ঢাকা শহরে কারেন্টের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। একবার চলে গেলে কখন যে আসবে কে জানে?

রতন খুব সাবধানে লিফটের দরজায় কয়েকবার ধাক্কা দিল। জোরে ধাক্কা দিতে সাহসে কুলাচ্ছে না। কল-কবজার কারবার–কী থেকে কী হয় কে জানে? দমবন্ধ হয়ে আসছে। লিফটম্যান ব্রাদারকে ডাকছে কিন্তু গলা থেকে যেন শব্দই বের হচ্ছে না। লিফটের দরজায় আরেকবার ধাক্কা দিল সে। এবার লিফট চলতে শুরু করল। কিন্তু কারেন্ট ছাড়া কীভাবে চলছে? আর এত জোরে শোঁ শোঁ শব্দ করে চলছেই বা কীভাবে? যেন মনে হচ্ছে আসমানে চলে যাবে। রতন মনে মনে সুরা পড়ে ফুঁ দিতে লাগল। সূরা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সে মেঝেতে বসে পড়ল। আর অদ্ভুতভাবে তখনই লিফটের দরজা খুলে গেল। খোলামাত্রই সে লাফ দিয়ে বের হয়ে পড়ল। কিন্তু কোথায় এসেছে সে? লাফ দিয়ে কি ভুল করলাম নাকি? মনে মনে ভাবতে লাগল সে। আবার লিফটে উঠার জন্য পেছনে ফিরল। কিন্তু লিফট নেই! লিফট কেন কোনো কিছুই নেই। চারদিকে ভয়াবহ শূন্যতা। আকাশ-টাকাশ কিচ্ছু নেই। এ কি বিপদে পড়লাম? আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কে করবে। এরপর চোখ বন্ধ করে ফেলল রতন।

আস্তে আস্তে চোখ খুলল রতন। অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে এবার। আগে কোনো শব্দ ছিল না। এখন শিস দেওয়ার মতো করে তীব্র শব্দ হচ্ছে। আচ্ছা সে কি মারা গেছে? এটা কি মৃত্যুর পরের জগৎ? 'তুমি কে?'

রতন চমকে গেল। প্রশ্নটা সে আবার শুনল কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না।

'এই তুমি কে?'

রতন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমার নাম রতন মেয়া।'

'তুমি এখানে কীভাবে এসেছ?'

'স্যার, আমি কিছুই জানি না। লিফটের ভিতর ছিলাম। লাফ দিয়া বাইর হইছি। আপনি কিছু একটা করেন । আমারে বাঁচান।'

'তোমার কথা তো আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রথম কথা হলো- তুমি মাত্রা ভাঙলে কীভাবে?'

'স্যার বিশ্বাস করেন, আমি কোনো কিছুই ভাঙি নাই। যদি কিছু ভেঙেও থাকে আপনা-আপনি ভাঙছে। তার জন্য আমি ক্ষমা চাই স্যার।'

'তুমি তো ভাই বিরাট সমস্যা তৈরি করলা? তুমি কি বুঝতে পারছ ব্যাপারটা কী ঘটেছে?'

'জে না।'

'তুমি ত্রিমাত্রিক জগৎ থেকে চতুর্মাত্রিক জগতে প্রবেশ করেছ। এটা কীভাবে করেছ আমরা জানি না। জানার

চেষ্টা করছি।'

'স্যার আমাকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। আমি খুব ভয় পাচ্ছি। আপনাদের মুখটাও দেখতে পাচ্ছি না। পেলে ভয়টা একটু কমত হয়ত।'

'আমরা ইচ্ছা করেই তোমাকে মুখ দেখাচ্ছি না। মুখ দেখলে আরো ভয় পাবে।'

'স্যার যে ভয় লিফটের মধ্যে পাইছি তারপর থেকে আর কোনো কিছুতেই ভয় পাবো না। এমনকি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সামনে গেলেও ভয় পাবো না।'

তোমার নাম কী যেন বললে– রতন?

'জি স্যার, রতন।'

'একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো– তুমি হচ্ছো ত্রিমাত্রিক জগতের মানুষ। তোমাদের জগতের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এই তিনটি মাত্রা আছে। এই দেখে তোমরা অভ্যস্ত। আমরা চার মাত্রার প্রাণী। আমাদের সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই।'

'স্যার আপনে আমার মতো বাংলায় কথা বলছেন, এটা শুনেই বেশ আনন্দ পাচ্ছি। আপনার চেহারা খারাপ হলেও অসুবিধা নাই।

'আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমাকে দেখো।'

রতনের শরীরে হঠাৎ কাঁপুনি লাগল। হঠাৎ এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগলে যেরকম অনুভূতি হয় ঠিক সেরকম অনুভূতি হচ্ছে তার। মনে হচ্ছে চারপাশের ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা পরিবেশ ভেদ করে কালোমতো একটা আবছা ছায়ার মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। রতন তার চোখের সামনে কী যেন দেখল। মানুষের মতোই তবে স্বচ্ছ কাচের তৈরি। একটা মুখের ভেতর আরেকটা মুখ, তার ভেতর আরেকটা–এরকম চলেই গিয়েছে। চোখ দুটাও যেন কাচের। চোখের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। একটা চোখের ভেতর আরেকটা, আবার তার ভেতর আরেকটা দেখা যাচ্ছে।

'তুমি কি ভয় পাচ্ছো?'

'জে না স্যার। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটু কিছু খেতে চাই। সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি।'

'কিন্তু এখানে তো খাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই!'

'তাহলে তো স্যার জায়গাটা সুবিধার না।'

'আমরা তো তোমাদের মতো দেহধারী না। শুধু দেহধারীদেরই খাদ্য লাগে। আর দেহধারী কারোরই এখানে আসার উপায় নেই।'

'কিন্তু স্যার আমি যে চলে এসেছি!'

'হুম... তুমি তো চলে আসলা। কিন্তু তুমি কীভাবে এসেছ কে জানে? সে রহস্য উন্মোচন করতে আমার টিম কাজ করে যাচ্ছে।'

'স্যার আপনাদের জায়গাটাতো সুবিধার না। এখানে দেহধারী কেউ নাই। আবার খাবারেরও ব্যবস্থা নাই। আমাদের জগতে সমুদ্র-নদী আছে। আপনাদের এখানে আছে?'

'আমাদের এখানেও আছে। কিন্তু আমাদের সমুদ্র তোমাদের মতো নয়। আমরা সময়ের সমুদ্রে বাস করি। তোমাদের কাছে সময় নদীর মতো প্রবাহমান কিন্তু আমাদের সমুদ্র হচ্ছে স্থির।'

'মনে কিছু নেবেন না স্যার। আপনার কথা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'না ঢোকারই কথা। তোমাকে দেখেও বিশেষ জ্ঞানী লোক মনে হয় না। তবুও তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

'স্যার মুর্খ লোকদের সবাই পছন্দ করে। তাদের সবাই ভালোবাসে। আমার স্যারও আমাকে খুব ভালোবাসেন।'

'চিন্তা করো না। আমরা তোমাকে ফেরার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তবে এখান থেকে ফেরার পর তোমার জীবন আনন্দময় হবে। তোমাকে আর চা-সিগারেট বানিয়ে ও পত্রিকা বিলি করতে হবে না।'

'কী করব বলেন স্যার, এটা ছাড়া তো রোজগারের কোনো উপায় নাই। পড়াশোনা হয় নাই। ম্যাট্রিকটাও দিতে পারলাম না।'

'তোমাকে ফেরত পাঠাচ্ছি ম্যাট্রিক পরীক্ষা শুরু হবার আগের দিন রাতে।'

'কীভাবে পারবেন স্যার?'

'সময় আমাদের কাছে স্থির। আমরা তা করতে পারি। তুমি যখন ফিরে যাবে তখন এখানকার স্মৃতি তোমার মনে থাকবে না। তোমার নতুন জীবন শুরু হবে। যে জীবনটা হবে আনন্দে ভরা। পড়াশুনায় তুমি হবে অত্যন্ত মেধাবী।'

'এখন কি স্যার আমি তাহলে চলে যাচ্ছি?'

'কিছুক্ষণের মধ্যেই যাচ্ছ।'

'আচ্ছা দোয়া রাখবেন স্যার। এই বিপদ থেকে মুক্তি পাবো কোনোদিন চিন্তাও করি নাই।

রতন হঠাৎ বুকে ধাক্কার মতো অনুভব করল। তার মনে হচ্ছে সে যেন ভাসছে শূন্যে। এখান থেকে সে কি নিচে পড়ে যাবে? আর ভাবতে পারছে না। তার দুটো চোখের পাতা বুজে আসছে। খুব ঘুম পাচ্ছে।

রতনের ঘুম ভেঙেছে।

সে তার গ্রামের বাড়িতে চৌকির উপর বই-খাতা মেলে পড়তে বসেছিল। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কী সর্বনাশের কথা! কাল বাংলা ১ম পত্রের পরীক্ষা। রাচি ভ্রমণ গল্পটা পড়ছিল। কিন্তু এরইমধ্যে অন্য একটা জগৎ থেকে যেন ঘুরে এল সে। পাশেই রাখা ছিল দুধের গ্লাস। মা কখন এসে দিয়ে গেছে টেরই পায়নি। অন্য দিন হলে এক ঢোকে সবটুকু শেষ করে ফেলত সে। কিন্তু আজ সম্ভব হয়নি। দুধের গ্লাসে হাত দিয়ে ধরার সময় মনে হলো গ্লাসটি আর গরম নেই। বরফের মতো ঠান্ডা! আচ্ছা, চতুর্মাত্রিক জগতে কি গরম বস্তুও ঠান্ডা হয়ে যায়? মনে মনে ভাবতে থাকল সে। ❐

দশম শ্রেণি, সিরোইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী

গল্প

প্রথম বন্ধুত্ব

আলমগীর কবির

মেয়েটির নাম মিঠাই। এত সুন্দর নামটি তার প্রিয় মা আদর করে রেখেছেন!

আজকে মিঠাই প্রথম ইশকুলে যাবে।

সারা বাড়িতে খুশির যেন মেলা বসেছে। বাবাও খুশি। মিঠাই-এর জন্য বাবা কিনে দিয়েছেন ইশকুল ড্রেস। মা কিনে দিয়েছেন ইশকুল ব্যাগ। দাদু কিনে দিয়েছেন জুতা। চাচ্চু দিয়েছেন রং-পেনসিল।

আরো কত কী!

আরো কিছু উপহার সবার কাছে এখনো পাওনা আছে!

মিঠাই আজকে প্রথম ইশকুলে যাবে। সে সবার চেয়ে বেশি খুশি। মিঠাইয়ের বড়ো ভাই ও মিঠু একই ইশকুলে পড়ে।

কতদিন মিঠাই বায়না ধরেছে ভাইয়ের সাথে ইশকুলে যাবে বলে। কিন্তু মিঠাইয়ের তো আর ইশকুলে যাবার বয়স হয়নি তখন। মন খারাপ করে বসে থাকত সে।

অবশেষে আজ স্বপ্ন পূরণের দিন এসেছে।

মা মিঠাইকে বলেন, ইশকুলে গিয়ে কারো সাথে ঝগড়া করবে না।

মিঠাই বলে, আচ্ছা। ঝগড়া করব না।

কারো সাথে মারামারি করবে না।

মিঠাই বলে, আচ্ছা, মারামারি করব না।

স্যার ম্যামদের সব কথা শুনবে।

মিঠাই বলে, আচ্ছা, সব কথা শুনব।

বাবার হাত ধরে আনন্দ আর খুশিমনে মিঠাই ইশকুলে যায়।

ক্লাসে গিয়ে মিঠাই সামনের একটা সিটে বসতে চাইল।

তার বয়সি একটা মেয়ে বলল, না এখানে বসা যাবে না। এটা ফারিহার সিট। মিঠাই পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসে।

স্যার, ম্যাডাম সবাই খুব ভালো। কিন্তু আজকে মিঠাইয়ের কেউ বন্ধু হতে চাইল না।

বাড়িতে মা যখন ইশকুলের গল্প শুনতে চাইলেন, মিঠাই মাকে সবটা বলে দেয়। মিঠাইয়ের মন খারাপ দেখে মায়েরও মন খারাপ হয়ে যায়। পরেরদিন মিঠাই ক্লাসে সময়মতো যেতেই একটা মেয়ে মিঠাইকে ডেকে বলে,

আমার কাছে তুমি বসতে পারো।

এই কথা বলে নিজের ব্যাগটা সরিয়ে মিঠাইয়ের জন্য বসার জায়গা তৈরি করে দেয়। মিঠাই হাসিমুখে বসে তার পাশে।

বলে,আমার নাম মিঠাই। তোমার নাম কি?

মেয়েটি বলে, আমার নাম ফারিহা।

তারপর দুজনার মাঝে খুব ভাব হয়ে যায়। টিফিন পিরিয়ডে সবাই মিলে গোল্লাছুট খেলছিল। হঠাৎ মিঠাই পা পিছলে পড়ে যায়। ফারিহা দৌড়ে গিয়ে তাকে হাত ধরে উঠায়। পায়ে একটু আঘাত লেগেছে। ফারিহা বলে, একটু দাঁড়াও। আমার ব্যাগে ঔষধ আছে। এখনি নিয়ে আসছি।

মিঠাই ইশকুলে নতুন বন্ধু পেয়ে অনেক খুশি হয়ে যায়। মিঠাই ভাবতে থাকে, আজকে মা যখন ইশকুলের গল্প শুনতে চাইবেন তখন সে ফারিহার কথা বলবে। সবকিছু শোনার পরে মায়ের মুখে সুন্দর হাসি ফুটবে। মিঠাই খুব আনন্দে তার পরের ক্লাস করতে থাকে। ❐

প্রাবন্ধিক ও শিশুসাহিত্যিক

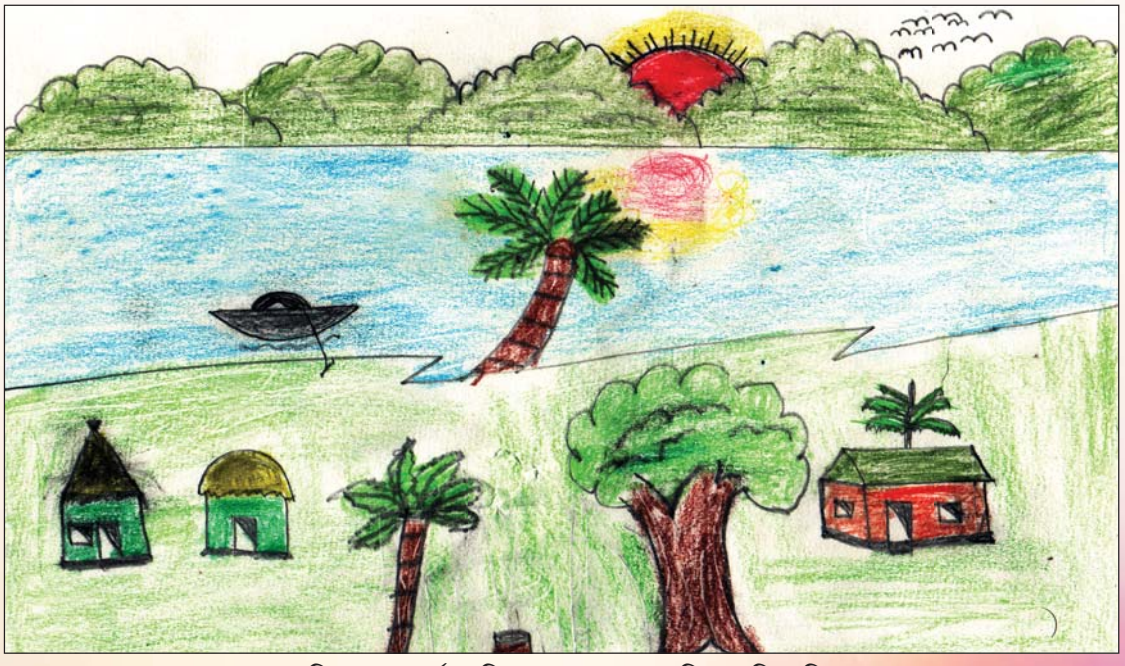

মাহমুদুল হাসান হিমেল, চতুর্থ শ্রেণি, কলাপারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শেরপুর

গল্প

অদল বদল

অনিরুদ্ধ কবীর অন্বয়

সভ্য একদিন একটি মুরগিছানা কিনে আনলো।

হলুদ রঙের তুলতুলে এক ছানা। বয়স চার কি পাঁচ দিন। সভ্য খুব যত্ন নিয়ে ছানাটি লালন-পালন করতে লাগল।

সভ্যদের বাসা লাগোয়া একটা নারকেল গাছে ছিল একটি কাকের বাসা। কাকের বাসায় ছিল সদ্যফোটা একটি কাকছানা। সভ্যর মুরগিছানাটি প্রায়ই মা কাকটিকে দেখত সে তার ছানাকে খাওয়াচ্ছে। তা দেখে মুরগিছানারও ওর মায়ের কথা মনে পড়ে।

দিন দিন ছানা দুটি বড়ো হতে লাগল। কাকছানাটি উড়তে শিখল। মুরগিছানাটি কাকছানার সাথে কথা বলার চেষ্টা করত। কিন্তু কাকছানা পর্যন্ত ওর কথা পৌঁছত না। অনেক চেষ্টার পরও মুরগিছানা ব্যর্থ হয়।

একদিন কাকছানা মুরগিছানার কাছে এসে বলল, কেমন আছো মুরগিছানা? মুরগিছানা চমকে ওঠে এবং তাকিয়ে দেখে প্রতিবেশি কাকছানাটি তার কুশল জানতে চাচ্ছে।

হ্যাঁ, ভালো আছি, মুরগিছানা জবাব দেয়।

কাকছানা কোনো ভণিতা না করে বলে, তুমি আমার বন্ধু হবে?

কাকছানা যেন মুরগিছানার মনের কথা বলে দিলো। সাথে সাথে মুরগিছানা ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

সেই থেকে দুটি ছানার সে-কী ভাব! গভীর বন্ধুত্ব। এরপর থেকে দুই বন্ধুর ভালোয় ভালোয় দিনকাল চলতে থাকে।

একদিন মুরগিছানা কাকছানাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার বাইরে ঘুরতে কেমন লাগে?

কাকছানা বলে খুব ভালো লাগে। কেন? তুমি কখনো বাইরে যাওনি?

মুরগিছানার মন খারাপ হলো। বলল, না গো! সেই ভাগ্য আমার হয়নি। দ্যাখো না আমি সারাক্ষণ এখানে বন্দি থাকি।

তুমি তো খুব ভালোভাবে থাকো, তোমার থাকার জায়গাও বেশ সুন্দর আর আরামদায়ক। তাহলে তুমি নিজেকে বন্দি বলছ কেন? আমি তোমার জায়গায় থাকলে খুশিতে লাফাতাম।

মুরগিছানা বলল, আমি তো তোমার মতো ঘুরতে পারি না, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারি না। আমি যদি তোমার মতো উড়তে পারতাম তাহলে বেশ হতো। দু'ছানা একে অপরের মনের ভাব প্রকাশ করে। একজন আরেকজনের মতো হওয়ার কথা বলে।

অবাক ব্যাপার হলো, এক রাতে এক পরি এসে ঠিক ঠিক ওদের মনের ইচ্ছা পূরণ করে দিলো। কাকছানা হয়ে গেল মুরগিছানা আর মুরগিছানা হলো কাকছানা। ওরা নিজেদের পরিবর্তন দেখতে পেয়ে আনন্দে নেচে ওঠে এবং একজন অন্যজনের মতো হতে পেরে ধন্যবাদ জানায়।

পরে মুরগিছানাটি তার মনের মতো স্বাধীনভাবে আকাশে উড়ে বেড়ায়। ঘুরে বেড়ায়। যেখানে খুশি সেখানে যায়। কিন্তু মুশকিল হলো কিছুক্ষণ ওড়াউড়ি, ঘোরাঘুরি করলেই ক্ষুধা লেগে যায়। সে বিভিন্ন জায়গায় খাবার খুঁজতে থাকে। কোথাও খাবার খুঁজে পায় না। এমনকি মুরগিদের দলে ভিড়েও না।

খাবার খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত মুরগিছানা, ঠিক তখনই এক কাক বন্ধুর সাথে তার দেখা হয়। কাক বন্ধুটি ওকে ক্লান্ত আর চিন্তিত দেখে জিজ্ঞেস করে, কিরে কি হয়েছে? তোকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?

জবাবে ও বলল, আমি সেই কখন থেকে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছি কিন্তু কোথাও খাবার খুঁজে পাচ্ছি না। ক্ষুধায় পেট চোঁ-চোঁ করছে।

তুই খাবার খুঁজে পাচ্ছিস না তো মুরগিদের এখানে কি করছিস? চল আমার সাথে চল। যেখানে আমাদের খাবার পাওয়া যাবে সেখানে চল।

কাকবন্ধু ওকে একটা ডাস্টবিনের কাছে নিয়ে যায় এবং বলে, তুই কি আমাদের এই জায়গার কথা ভুলে গেছিস? এখানে আমরা প্রায়ই খাবার খাই। এখন তুই তোর যত ইচ্ছা হয় তত খাবার খেয়ে নে।

মুরগিছানাটি যে কাকছানা হয়ে গেছে সেটা কাকবন্ধু জানে না। মুরগিছানাটি এই খাবারগুলো দেখে বলে ওঠে, ছিঃ ছিঃ, এসব নোংরা খাবার খেতে হবে? এই নোংরা খাবার আমি খেতে পারব না।

পারবি না মানে! আমরা তো সবসময় এসব ময়লা-আবর্জনাই খাই। আজ তোর কি হয়েছে?

কাকরূপী মুরগিছানার হঠাৎ খেয়াল হলো সে তো সত্যিকারের কাক নয়, কাকের আদলে মুরগিছানা। তাই নিজের আসল পরিচয় আড়াল করে কাকবন্ধুকে বলে, না আমি এভাবেই দুষ্টুমি করছিলাম।

অন্যদিকে কাকছানা মুরগিছানা হয়ে খুব বিপদে পড়েছে। সে খাঁচা থেকে বের হওয়ার খুব চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

কিছুক্ষণ পরে সভ্য মুরগিছানার জন্য সুন্দর সুন্দর খাবার নিয়ে আসে। দেখে মুরগিছানা ছটফট করছে। তা দেখে সে বলে, তুমি এমন করছ কেন মুরগিছানা? তুমি কি অসুস্থ? সভ্যর কথায় কাকছানারও মনে পরে যে সে মুরগিছানা হয়ে গেছে। তাকে এখন ভদ্রভাবে থাকতে হবে। বাইরে বের হতে পারবে না। সভ্য তাকে যে খাবার দিয়েছিল সেটা সে নিজের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে চারপাশ ময়লা করে খেতে থাকে। তাকে খেতে দেখে সভ্য অবাক। সে বলে, কি হয়েছে তোমার আজ? তুমি এমন করছ কেন? তোমাকে তো এর আগে এরকম দুষ্টুমি করতে দেখিনি কখনো। এই কথা শুনে কাকছানাটি চুপচাপ থাকার চেষ্টা করে কিন্তু থাকতে পারে না।

সে মুরগিছানার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

একটু পরেই মুরগিছানা ফিরে আসে। এসেই জিজ্ঞেস করে, আজ আমার ঘরে তোমার দিন কেমন কাটল? জবাবে কাকছানা বলল, আগে বুঝতে পারিনি তুমি এখানে এভাবে থাকো। খুব কষ্ট। আমি আর এখানে থাকতে চাই না। আমি আমার মতো হতে চাই। মুরগিছানাও সাথে সাথে বলে উঠল, আমিও আমার আগের জায়গায় ফিরে যেতে চাই। আমি ভেবেছিলাম তুমি যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারো। কিন্তু তোমার মতো আমি ঘুরতে গিয়ে বড়ো পাখির আক্রমণের শিকার হয়েছিলাম। আমি কোনোরকমে বেঁচে ফিরেছি। পরে আমাকে নোংরা খাবার খেতে হয়েছে। আমি এভাবে থাকতে পারব না।

দিন শেষে রাত হয়ে আসে। পরিটা ওদের ইচ্ছা মেটাতে ওদেরকে যার যার অবস্থায় ও জায়গায় ফিরিয়ে দেয়।

পরেরদিন যখন ওরা ওদের নিজেদের জায়গায় আবিষ্কার করে, আনন্দে লাফিয়ে ওঠে এবং ওদের মতো দিন যাপন করতে থাকে।

তবে ওদের বন্ধুত্ব সবসময় অটুট থাকে। ❐

প্রাবন্ধিক ও শিশুসাহিত্যিক

মেঘের অনেক নাম

সানোয়ার সাকিব

মেঘ আমাদের কাছে প্রকৃতির এক সুন্দর উপহার, যাকে দূর থেকে শুধু দেখা যায়- ছুঁয়ে দেখার উপায় নেই। দূর থেকে দেখতে দেখতে মানুষ এক সময় মেঘকে নিয়ে লিখেছে গান, কবিতা। রেখেছে মেঘের নাম। নানা নামে মেঘকে ডেকেছে মানুষ, বৃষ্টি চেয়েছে মেঘের কাছে। পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন তার *নকশী কাঁথার মাঠে* বর্ণনা করেছেন নানা রকম মেঘের কথা– কালিয়া মেঘ, প্রভাতী মেঘ, কাজল মেঘ, ধূলট মেঘ, তুলট মেঘ, আড়িয়া মেঘ, হাড়িয়া মেঘ, সিঁদুর মেঘ, কানা মেঘ, কালো মেঘ, কুড়িয়া মেঘ, ফুলতোলা মেঘ, আরও কত যে নাম!

প্রাচীন ভারতীয় কবি কালিদাস মেঘ নিয়ে বিখ্যাত মেঘদূত কাব্য লিখেছেন, সেখানে মেঘকে ডেকেছেন বিভিন্ন নামে। বাংলা ভাষায় রয়েছে মেঘের অনেক নাম– জীমূত, ঘন, বারিবাহ, নীরদ, জলধর, কাদম্বিনী, সংবর্তক, জলদ, বারিদ, পয়োদ, অভ্র, পর্জন্য, পয়োমুক, বারিবাহন ইত্যাদি। গ্রামবাংলার অনেক বয়স্ক মানুষ মেঘ চেনেন এবং বুঝতে পারেন মেঘের ভাষা। অনেক প্রবীণরা তাই মেঘ দেখেই আবহাওয়ার আভাস পেয়ে যান। আকাশে বিভিন্ন আকৃতির, বিভিন্ন রঙের এবং বিভিন্ন প্রকৃতির মেঘ দেখা যায়। ক্ষণে ক্ষণে এই সব মেঘের চরিত্রও পরিবর্তিত হয়। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেকগুলো মেঘ একসঙ্গে মিশে আকাশে ভেসে বেড়ায়। তাই মেঘের শ্রেণীবিভাগ করা খুবই কঠিন ব্যাপার।

আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সমিতি ১৮৯৪ সালে আকার ও উচ্চতা অনুসারে মেঘকে দশ ভাগে ভাগ করে। পরবর্তী সময়ে আকাশের বুকে ২৮ রকম মেঘের কথা বলা হয়। বহুকাল থেকে মানুষ মেঘের বিভিন্নতা লক্ষ করলেও ১৮০৩ সালে ইংরেজ রসায়নবিদ লিউক হাওয়ার্ড মেঘের শ্রেণিবিন্যাসে বিশেষ তৎপর হন। অনেক মেঘের উচ্চতার অবস্থান অনুসারে মেঘকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

- নিচুমেঘ (ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ২,১৩৫ মিটার)
- মাঝারি উঁচুমেঘ (২,১৩৫ মিটার ৬,০৯৭ মিটার)
- উঁচুমেঘ (৬,০৯৭ মিটার ১২,৩৫০ মিটার)।

তিনি আকৃতি ও চেহারা অনুসারে মেঘকে চারভাগে ভাগ করেন–

- সিরাস বা অলক মেঘ
- স্ট্রাটাস বা স্তর মেঘ
- কিউমুলাস বা স্তূপ মেঘ, এবং
- নিম্বাস বা নীরদ মেঘ বা ঝা মেঘ বা বাদল মেঘ।

এখন জেনে নেই এসব মেঘের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য :

১. উঁচুমেঘ

সিরাস বা অলক মেঘ : অলক শব্দের অর্থ কেশগুচ্ছ। আকাশে সর্বোচ্চ স্তরের মেঘ ঘোড়ার লেজ বা ঝাটা বা চামরের মতো এই মেঘের আকৃতি। সাদা ও স্বচ্ছ এই মেঘ দিনের আলোয় সাদা পালকের মতো দেখায়, কিন্তু সূর্যাস্তের আলোয় অপূর্ব বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করে। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকে, এ মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত প্রায় হয়ই না।

সিরো-কিউমুলাস বা অলক-স্তূপ মেঘ: গোলাকার ছোটো ছোটো সাদা মেঘগুলো ঢেউ-এর মতো আকাশে

ভেসে থাকে। অতি সূক্ষ্ম তুষারকণা দিয়ে এই মেঘে আবহাওয়া পরিষ্কার থাকে, বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না।

সিরো-স্ট্রাটাস বা অলক-স্তর মেঘ: পাতলা ফিনফিনে সাদা পর্দা বা চাদরের মতো দেখতে এই মেঘের মধ্য দিয়ে সূর্য ও চাঁদকে উজ্জ্বল মণ্ডলের মতো দেখায়। ঝড়ের সঙ্কেত বহন করে। আকাশ পরিষ্কার থাকে কিন্তু কখনও কখনও বৃষ্টি হয়।

অল্টো-কিউমুলাস বা মাঝারি উঁচুস্তূপ মেঘ: গোলাকার পশমগুচ্ছের আকৃতিবিশিষ্ট এই মেঘের রং ধূসর। এই মেঘের মাঝে মাঝে নীল আকাশ দেখা যায়। মেঘের স্তূপগুলো আকারে বড়ো এবং ঢিবির মতো দেখায়। আকাশ পরিষ্কার থাকে।

২. মাঝারি উঁচুমেঘ

অল্টো-স্ট্রাটাস বা মাঝারি উঁচুস্তর মেঘ: এই মেঘের রং ধূসর বা নীল। চাদরের মতো সমগ্র আকাশ জুড়ে ভেসে থাকে। এই মেঘের মধ্য দিয়ে সূর্যরশ্মি ক্ষীণভাবে আসে এবং সূর্যকে আবছা ও অনুজ্জ্বল দেখায়। বৃষ্টিপাত হয় এবং অনেকক্ষণ ধরে চলে।

৩. নিচুমেঘ

স্ট্রাটো-কিউমুলাস বা নিচুস্তর মেঘ: মাঝ আকাশের অল্টো-কিউমুলাস মেঘ আরো ভারী ও ঘন হয়ে নিচে নেমে আসে। অনেক সময় কিউমুলাস মেঘের ওপর ও নিচের অংশ সমতল হয়ে এই মেঘের সৃষ্টি করে। রং ধূসর থেকে কালো পর্যন্ত হয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শীতকালে এই মেঘ অনেক সময় সারা আকাশ ঢেকে ফেলে। কখনো কখনো এই মেঘের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

স্ট্রাটাস বা স্তর মেঘ: ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ২ কি.মি.-র মধ্যে এই মেঘ দেখা যায়। সাদা ও ধূসর রঙের হয় এবং দিগন্তের নিকট পরপর সমান্তরালে সজ্জিত অবস্থায় থাকে। কুয়াশার চাদরের মতো এই মেঘ সারা আকাশ ঢেকে রাখে। এই মেঘের মধ্য দিয়ে পাহাড়ে ওঠা, বিমান চালানো প্রভৃতির অসুবিধা দেখা দেয়। এই মেঘে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত হয়।

নিম্বাস বা বাদল বা নীরদ মেঘ: মেঘের রং গাঢ় ধূসর বা কালো। এই মেঘে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে এর নাম নিম্বাস বা বাদল বা নীরদ মেঘ। ভূ-পৃষ্ঠের খুব কাছের এই মেঘ সারা আকাশ ঢেকে থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

মজার ব্যাপার হলো, আকাশ জুড়ে হরেক রকমের মেঘ থাকলেও কোনো একটি মেঘকে কিন্তু আলাদাভাবে বিশেষ দেখা যায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটির সঙ্গে আরেকটি বা অনেক মেঘ একত্রে মিশে আকাশে ভেসে বেড়ায়। উঁচু আকাশের (ছয় হাজার মিটারের ওপরে) মেঘগুলো নিজেদের আকৃতি, রং, চেহারা সবসময় পালটাতে থাকে এবং যে-কোনো সময় অন্যরকম মেঘে পরিবর্তিত হয়। এ কারণে আবহাওয়াবিদরা আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে মাঝে মাঝে ভীষণ জটিলতার সম্মুখীন হন। মেঘের ধরন, গঠন ও অবস্থান জানার জন্য তাই তারা মেঘের ওপর উজ্জ্বল আলোকরশ্মি ফেলেন এবং মেঘের ওপর সেই প্রতিফলিত আলোক বিশ্লেষণ করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে চেষ্টা করেন। ❐

তথ্যসূত্র:

নকশী কাঁথার মাঠ, পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন

বৃষ্টি ও বজ্র, মুহাম্মদ ইব্রাহীম, বাংলা একাডেমি

প্রাবন্ধিক

isabyi i‡Oi ‡Ljv

ইসমত আরা

আকাশে ঘন মেঘ। চারদিক অন্ধকার হয়ে ঝুম বৃষ্টি। মেঘ করে বৃষ্টির পর আকাশ হয়ে যায় ঝকঝকে। আকাশে তখন আবার সূর্য ওঠে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির পর আকাশে নানা রঙের ঝিলিক দেখা যায়। মনে হয় নানা রঙের ধনুক আকাশ জুড়ে আছে। নানা রঙের এই ধনুককে বলে রংধনু। রংধনু বা রামধনু বা ইন্দ্রধনু হলো একটি দৃশ্যমান ধনুকাকৃতি আলোর রেখা যা বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত জলকণায় সূর্যালোকের প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের ফলে ঘটিত হয়। সাধারণত বৃষ্টির পর আকাশে সূর্যের বিপরীত দিকে রংধনু দেখা যায়। রংধনুতে সাতটি রঙের সমাহার দেখা যায়। দেখতে ধনুকের মতো বাঁকা হওয়ায় এটির নাম রংধনু।

আকাশে কেন রংধনু দেখা যায়

বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার মনে হয়। কিন্তু কিছু কিছু পানির কণা তখনও বাতাসে ভাসতে থাকে। সূর্যের আলো এ পানির কণা ভেদ করে পৃথিবীতে আসে। পানির কণা ভেদ করার সময় সূর্যের আলো বেঁকে যায়। আর সূর্যের সাদা রং সাতটি রঙে ভাগ হয়ে যায়। এ রংগুলো হলো- বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। এ সাতটি রংকে আমরা রংধনুর আকারে আকাশে দেখি। আকাশে রংধনু সব সময় সূর্যের উলটো পাশে দেখা যায়। রংধনু উঠলেই বোঝা যায় বৃষ্টি আর হবে না। রংধনু ওঠে দু'টি করে!! আসল যে রংধনু তার একটু উপরে আরেকটি রংধনু ওঠে। সেটা অবশ্য আসল রংধনুর চেয়ে কম উজ্জ্বল, আর রংগুলোও থাকে বিপরীতক্রমে। আর এই দুই রংধনুর মাঝখানের অংশে আকাশের অন্যান্য অংশের চেয়ে আলো একটু কম থাকে। এগুলো অবশ্য খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায় না।

সাতটি রং আলাদা করে কেন দেখা যায়

সাতটি রঙের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যও আলাদা। তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলাদা বলেই আলোগুলোর আলাদা আলাদা রং হয়। এ কারণেই প্রতিটি আলোর বেঁকে যাওয়ার পরিমাণও আলাদা হয়। যেমন লাল রঙের আলো ৪২ ডিগ্রি কোণে বাঁকে। আবার বেগুনি রঙের আলো বাঁকে ৪০ ডিগ্রি কোণে। অন্য রঙের আলোগুলো ৪০ ডিগ্রি থেকে ৪২ ডিগ্রির মধ্যে বাঁকে। এই কারণে রংধনুর রংগুলোকে সবসময় একটি নির্দিষ্ট সারিতে দেখা যায়।

রংধনুর প্রকারভেদ

প্রাইমারি রেইনবো বা প্রাথমিক রংধনুর সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। ঝুমবৃষ্টির পরপরই এর দেখা মেলে। যখন পানির কনার উপর আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে তখনই প্রাইমারি রেইনবো দেখা যায়। জলবিন্দুর আকার বড়ো হলে রংধনুর রঙের তীব্রতাও বেশি হয়। আকাশে প্রাইমারি রেইনবো দেখা দেওয়ার কিছুক্ষণ পর সেকেন্ডারি রেইনবো দেখা যায়। এ রংধনুর রেখা থাকে দু'টি। এটি প্রাইমারি রেইনবোর পেছনে থাকে। প্রাইমারি রেইনবোর আলো বিচ্ছুরিত হয়ে যখন পেছনে পড়ে, তখন সেটাকে সেকেন্ডারি রেইনবো বলে। আলেকজান্ডার'স ডার্ক ব্যান্ড প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি রেইনবোর সমন্বয়ে গঠিত হয়। আকাশে এ দুই রংধনুর মধ্যবর্তী অংশকে আলেকজান্ডার'স ডার্ক ব্যান্ড বলে। এ অংশটি আকাশের অন্য অংশের তুলনায়

বেশি কালো হয়। এসময় প্রাইমারি রেইনবোর আলো আলেক্সান্ডার'স ডার্ক ব্যান্ডের ভেতর ও সেকেন্ডারি রেইনবো বাইরের অংশে আলো ফেলে। সুপার নিউমারারি রেইনবো যখন প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি রেইনবোর মাঝে অনেকগুলো রংধনুর জন্ম হয়, তখন তাকে সুপার নিউমারারি রেইনবো বলে। সূর্যোদয় বা অস্তের সময় যদি বৃষ্টি হয় তাহলে রেড রেইনবো দেখা যায়। ক্লাউড রেইনবো মেঘের ক্ষুদ্র জলকণা থেকে সৃষ্টি হয়। এ রংধনু অনেক বড়ো হয়। লুনার রেইনবো চাঁদের আলোতে দেখা যায়। তবে পূর্ণিমা রাতে কখনো কখনো লুনার রেইনবোর দেখা মেলে।

রংধনুর স্থায়িত্ব

রংধনু সাধারণত ১০ থেকে ১৫ মিনিট স্থায়ী হয়। কিন্তু ২০১৭ সালের ৩০ শে নভেম্বর তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেই শহরে যে রংধনু তৈরি হয়েছিল তা স্থানীয় সময় সকাল ৬ টা ৫৭ মিনিটে আবির্ভূত হয় এবং বিলীন হয় স্থানীয় সময় বিকাল ৩ টা ৫৫ মিনিটে। সব মিলিয়ে ৮ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। বিশ্ব জলবায়ু সংস্থার তথ্য মতে এটাই ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি সময় স্থায়ী রংধনু । এর আগের রেকর্ড ছিল ইংল্যান্ডের ইয়োর্কশায়ারে ১৯৯৪ সালে আবির্ভূত হওয়া একটি রংধনু যা ৬ ঘণ্টা স্থায়ী ছিল।

বিরল গোলাকার রংধনু

আমরা জানি সাধারণত রংধনু অর্ধবৃত্তাকার, কিন্তু রংধনু মূলত গোলাকৃতির। ২০১৩ সালে কলিন লিওনহার্ড একটি বৃত্তাকার রংধনুর ছবি তুলেছিলে অস্ট্রেলিয়ার পার্থের কৌটেস্লো সমুদ্রতটের উপর থেকে, হেলিকপ্টারে বসে। হেলিকপ্টারটি তখন উড়ছিল অস্তায়মান সূর্য ও বৃষ্টির মাঝখান দিয়ে। বৃত্তাকার রংধনু দেখতে চাইলে আকাশে উড্ডীয়মান থাকতে হবে এটি তৈরি হওয়ার সময়, অন্যথায় মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা দিগন্তের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া অংশটি দেখতে পাবো না, যেহেতু পৃথিবী একটি বৃত্ত। ❐

প্রাবন্ধিক

আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের দুই পদক

আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের (আইএমও) ৬৫ তম আসরে বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থীরা দুটি ব্রোঞ্জপদক ও চারটি সম্মানজনক স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। এবছর আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের ৬৫তম আসর বসে ইংল্যান্ডের বাথ শহরে। ১৫ই জুলাই উদবোধন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় এবারের আসরের। চলতি বছর এই আয়োজনে ১০৮টি দেশের মোট ৬০৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

এবারের গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দলের হয়ে ব্রোঞ্জপদক পেয়েছেন ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মনামী জামান ও ঢাকা কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী এস এম এ নাহিয়ান। মনামী পেয়েছে ২০ নম্বর ও নাহিয়ান ১৭।

এছাড়া বাকি চারজন পেয়েছেন সম্মানজনক স্বীকৃতি। দলীয়ভাবে বাংলাদেশের ৬ শিক্ষার্থী মিলে ২৫২-এর মধ্যে পেয়েছেন ৮৩ নম্বর। দলীয়ভাবে ১৯২ পেয়ে প্রথম হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ৫টি স্বর্ণপদক ও ১টি রৌপ্যপদক পেয়েছে তারা। ১৯০ নম্বর ও একই সংখ্যক পদক নিয়ে দ্বিতীয় হয়েছে চীন। আর ১৬৮ নম্বর পেয়ে ২টি স্বর্ণপদক ও চারটি রৌপ্যপদক অর্জন করে তৃতীয় হয়েছে কোরিয়া। বাংলাদেশের স্থান ৬৫তম।

এ ছাড়া বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা ৭০তম, পাকিস্তান ৭৫তম, মিয়ানমার ৮৯তম, নেপাল ৯০তম স্থান এবং ভুটান ১০৩তম স্থান অধিকার করেছে।

প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের জ্যামিতি, কম্বিনেটরিক্স, নাম্বার থিউরি ও বীজগণিতের মোট ছয়টি সমাধান করতে হয় দুই দিনে। প্রতিদিন তিনটি সমাধানের জন্য সাড়ে চার ঘণ্টা করে মোট ৯ ঘণ্টা সময় পাওয়া যায়। প্রতিটি দেশের প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ ছয়জন প্রতিযোগী অংশ নেন।

এবারেরসহ বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে ১টি সোনা, ৭টি রুপা, ৩৭টি ব্রোঞ্জ ও ৪৪টি সম্মানজনক স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। ২১শে জুলাই আয়োজক দেশ যুক্তরাজ্যের বাথ শহরে ৯০ বছরের পুরোনো 'দ্য ফোরাম' হলে সমাপনী পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

নারী হকির 'নাম্বার ১০'

২৩শে জুন সিঙ্গাপুরে শেষ হওয়া এশিয়ান হকি ফেডারেশন (এএইচএফ) কাপ অনূর্ধ্ব-২১ নারী হকিতে ৬ ম্যাচে ১০ গোল দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে দিনাজপুরের মেয়ে অর্পিতা পাল। ৩টিতে হয়েছে সেরা খেলোয়াড়।

এএইচএফ কাপ অনূর্ধ্ব-২১ নারী হকিতে দ্বিতীয়বার অংশ নিয়ে ছয় ম্যাচের পাঁচটিতেই জিতেছে বাংলাদেশ দল, যার তিনটিতে ম্যাচ সেরা হয়েছে অর্পিতা। সাত দলের মধ্যে দ্বিতীয় হয়ে অক্টোবরে অনুষ্ঠেয় জুনিয়র নারী এশিয়া কাপে প্রথমবারের মতো খেলার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের ৩১ গোলের সর্বোচ্চ ১০টি মিডফিল্ডার ও দলের 'নাম্বার টেন' অর্পিতার, যার ৯টিই পেনাল্টি কর্নারে। বাংলাদেশকে ভরসা জুগিয়েছে অর্পিতার স্টিক। দিনাজপুরের প্রান্তিক এক পরিবার থেকে উঠে আসা এই অর্পিতা কীভাবে হলো নাম্বার টেন, নবারুণের বন্ধুরা এবার তোমাদের সেই গল্প শোনাবো।

৬ ম্যাচের ৩টিতে সেরা হয়েছে অর্পিতা

দিনাজপুর শহরের জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হওয়ার পর অ্যাথলেট হওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু করে অর্পিতা পাল। হাই জাম্প, জ্যাবলিং আর ১০০ মিটার দৌড়ে স্কুলের পাশাপাশি জেলা পর্যায়ের জুনিয়র গ্রুপেও নাম লেখায়। জেলা দলের হয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কারও জিততে থাকে সে। হঠাৎ একদিন স্কুলে শুরু হয় মেয়েদের হকি অনুশীলন ক্যাম্প। তাতে নাম লেখায় অর্পিতা। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়েটা সেই প্রথম হকিস্টিক হাতে নেয়। এক মাস চলল অনুশীলন। এরপর দিনাজপুরের গোর-এ-শহীদ বড়ো ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো হকি টুর্নামেন্ট। চ্যাম্পিয়ন হলো অর্পিতাদের স্কুল। ততদিনে হকির সঙ্গে ভালোবাসা হয়ে গেছে অর্পিতার। স্কুলের অনুশীলনে যাদের কাছে হাতেখড়ি, তারা তখন বড়ো মাঠে প্রশিক্ষণ দেন। অর্পিতা যোগ দিল সে প্রশিক্ষণে। শুরু হলো হকির সঙ্গে অর্পিতার পথচলা।

হংকংয়ের সঙ্গে ম্যাচে অর্পিতা পাল

২০১৯ সালে ঢাকায় মেয়েদের দল গঠন হলো। দিনাজপুর থেকে ক্যাম্পে সুযোগ পেল অর্পিতা। ঢাকায় তৃতীয় দফা ক্যাম্প করার পরই অনূর্ধ্ব-২১ এশিয়ান হকি ফেডারেশন (এএইচএফ) কাপ নারী হকির আসরের জন্য নির্বাচিত হলো।

সিঙ্গাপুরে বসেছিল সেই আসর। আন্তর্জাতিক হকিতে বাংলাদেশের মেয়েদের সেটিই অভিষেক। প্রতিটি ম্যাচেই খেলার সুযোগ পায় অর্পিতা। সেই আসরে একটি ম্যাচ জেতে বাংলাদেশ।

চার বছর পর ২০২৩ -এর আগস্টে আবার আসে আন্তর্জাতিক হকি খেলার সুযোগ। ওমানে ফাইভ আ সাইড বিশ্বকাপ বাছাই হকিতে বাংলাদেশের জার্সিতে গোলের বন্যা বইয়ে দিয়ে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ২০ গোল করে অর্পিতা। ফাইভ আ সাইড হকিতে বাংলাদেশ জেতে তিনটি ম্যাচ।

২০২০ সালে বিকেএসপিতে শুরু হওয়া মেয়েদের হকির প্রথম ব্যাচের ছাত্রী অর্পিতা এবার মানবিক বিভাগ থেকে এসএসসি পাস করেছে।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

বাংলাদেশি কিশোরের বাজিমাত

আমেরিকায় ১৬ বছর বয়সি এক কিশোর একাই বিমান চালিয়ে বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তিনি হলেন বাংলাদেশি কিশোর আহনাফ আবিদ মাহির। তিনি প্রথম বাংলাদেশি কিশোর হিসেবে আমেরিকাতে বিমান উড্ডয়ন করার তকমা লাভ করলেন। লস এঞ্জেলসে হোয়াইটম্যান বিমানবন্দর থেকে একাই স্থানীয় সময় ৩০শে জুন সকাল সাতটায় বিমান উড্ডয়ন করেন ও সফলভাবে বিমানটি অবতরণ করান। মাহিরের বাবার নাম মইনুল হক এবং মায়ের নাম আয়েশা রুমা। আজ থেকে নয় বছর আগে বাবা-মায়ের সাথে সাত বছরের ছোট্ট মাহির বিমানে চড়ে চলে আসেন আমেরিকায়। সেই বিমানে চলার সময় থেকেই নীল আকাশে ডানা মেলে ওড়ার স্বপ্নটা তার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তার বাবা-মা তাকে লস এঞ্জেলেসের একটি ফ্লাইং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করিয়ে দেন। এখান থেকেই মাহিরের সফলভাবে বিমান উড্ডয়ন করার প্রশিক্ষণ শুরু। ৯ বছর বয়স থেকে স্বপ্ন দেখে অবশেষে তার ১৬তম জন্মদিনের শুভ মুহূর্তে প্রথম একা বিমান চালানোর মতো দুঃসাহসী কাজ করেন। মাহিরের ফ্লাইট ইন্সট্রাক্টর হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ইলিয়াস খান। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নিয়ম অনুযায়ী ১৬ বছরে পা রাখার দিন থেকে একা বিমান চালানোর অনুমতি নিয়ে এসে প্রথম বিমান চালিয়েছে সে। তবে এখনই তাকে যাত্রীবাহী বিমান চালানোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। আমেরিকায় প্রথম কোনো বাংলাদেশির এমন অভূতপূর্ব সাফল্যে আনন্দিত হয়েছেন প্রবাসি বাংলাদেশিরাও।

জাপানের অ্যানিমেশন ইন্ডাস্ট্রিতে বাংলাদেশি

আমরা সবাই জানি অ্যানিমেশন জগতে জাপানের অবস্থান আকাশছোঁয়া। আর সেখানেই এবার বাজিমাত করলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এক তরুণ। তিনি হলেন চারবার অস্কার শর্টলিস্টেড ফিল্মমেকার সায়েম হক- যিনি একাধারে রাইটার, ডিরেক্টর এবং প্রডিউসার। প্রথম বাংলাদেশি আমেরিকান চিফ ক্রিয়েটিভ এক্সিকিউটিভ হিসেবে কাজ শুরু করেছেন জাপানের D'ART Shtajio তে । একটি প্রখ্যাত অ্যানিমেশন স্টুডিও D'ART Shtajio। যা বহু জনপ্রিয় অ্যানিমেশন প্রজেক্টের জন্য পরিচিত। সায়েম অ্যানিমি ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন ধারণা ও সৃজনশীলতা আনতে কাজ করছেন। তার এই অর্জন তরুণ বাংলাদেশি ও আমেরিকানদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা হিসেবেও কাজ করবে।

Things That Fall, The Stranger, Panorama সহ তার চলচ্চিত্রগুলো AT&T Film Award, a Stage 32 Film Award, an ISA- এর মতো বড়ো বড়ো পুরস্কার অর্জন করেছে। জাপানিজ অ্যানিমিকে অনেকেই কার্টুন ভেবে ভুল করে। আসলে এটি জাপানের বড়ো একটি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে বেরিয়েছে চোখ-ধাঁধানো সব অ্যানিমি সিরিজ। Star Wars Visions, The Weekenders, The Boys Presents, Pokemon- এর মতো সাড়া জাগানো প্রকল্পগুলো এই প্রতিষ্ঠানের।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

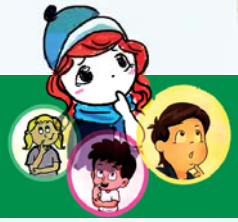

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. শব্দকোষ, চলচ্চিত্র, ৪.অলঙ্কার, ৫. বড়ো কচ্ছপ, ৬.আঙুলের অগ্রভাগস্থিত উপাস্থি, ৮. চলচ্চিত্র, ৯.কমলালেবু, ১০.বাংলাদেশের একটি ঋতু, ১১.ইশারা

উপর-নিচ:
১. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী'র রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ, ২.আমলকি, ৩.উষ্ণ, ৪. হেমন্তকালের জাত ধান, ৭.কাঠের তৈরি পাদুকা, ৯.বাহু ও হস্তের মিলনস্থল, ১০.বৃহৎ

১.		২.		■	■	৩.	■
	■		■	৪.			
	■	৫.			■		■
	■	■	■	৬.	৭.	■	■
৮.				■		■	■
	■	■	■	৯.			■
■	১০.		■		■	■	■
■		■	■	১১.			■

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যেসব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: উইকিপিডিয়া, ঠিকানা, কাক, অলকানন্দা, পাল, কাবাডি, নানা, বাইশ, তাল, ধান, পিঠাপিঠি, কান, নাক, কাল, কপাল

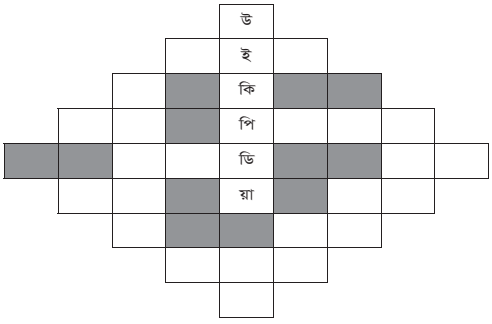

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৫		৭		১১		৭১		৭৯
	৩		৯		৬৯		৮১	
১		১৭	১৬		৬৮	৭৩		৭৭
	১৯			১৪			৭৫	
	২৪	২৫	৪৪		৬৪	৬৫		৫৯
২২		২৬		৪৬		৬২	৬১	
	২৮		৪২		৪৮		৫৬	৫৭
৩০		৩৪		৪০		৫০	৫৫	
	৩২		৩৬		৩৮			৫৩

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৪	*		+	৩	=	
/	■	+	■	*	■	-
	*	২	-		=	৩
+	■	*	■	-	■	+
১	*		+	২	=	
=	■	=	■	=	■	=
	+	৭	-		=	৯

জুন মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

■	সু	ই	ডে	ন	■	■	গা
■	ন্দ	■	ন	■	■	■	ম্বি
■	র	■	মা	ল	য়ে	শি	য়া
■	ব	■	র্ক	■	■	র	■
বা	ন	র	■	মা	■	দাঁ	■
দ	■	■	■	চা	ম	ড়া	■
ল	স	ক	র	■	রি	■	■
■	■	■	■	■	চ	ঞ্চু	রী

ব্রেইন ইকুয়েশন

৩	*	৪	-	৫	=	৭
+	■	/	■	-	■	+
২	-	১	+	৬	=	৭
*	■	+	■	/	■	*
১	*	৩	-	২	=	১
=	■	=	■	=	■	=
৫	+	৭	+	২	=	১৪

ছক মিলাও

			নি					
		গ	র	ম				
		■	হ	■	■			
	■	■	ক	ষ্কা	ল	সা	র	
ক্ষ	রা	সি	■	র	■	ধা	■	■
	■	পা	■	■	চ	র	ণ	
		হি	জ	ল	■	ণ		
			■	ব	ক			
				ণ				

নাম্ব্রিক্স

১	২	৩	৪৬	৪৭	৫০	৫১	৮০	৭৯
৮	৭	৪	৪৫	৪৮	৪৯	৫২	৮১	৭৮
৯	৬	৫	৪৪	৪৩	৫৪	৫৩	৭৬	৭৭
১০	১৫	১৬	১৭	৪২	৫৫	৫৬	৭৫	৭৪
১১	১৪	১৯	১৮	৪১	৪০	৫৭	৭২	৭৩
১২	১৩	২০	৩৫	৩৬	৩৯	৫৮	৭১	৭০
২৩	২২	২১	৩৪	৩৭	৩৮	৫৯	৬৮	৬৯
২৪	২৭	২৮	৩৩	৩২	৬১	৬০	৬৭	৬৬
২৫	২৬	২৯	৩০	৩১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫

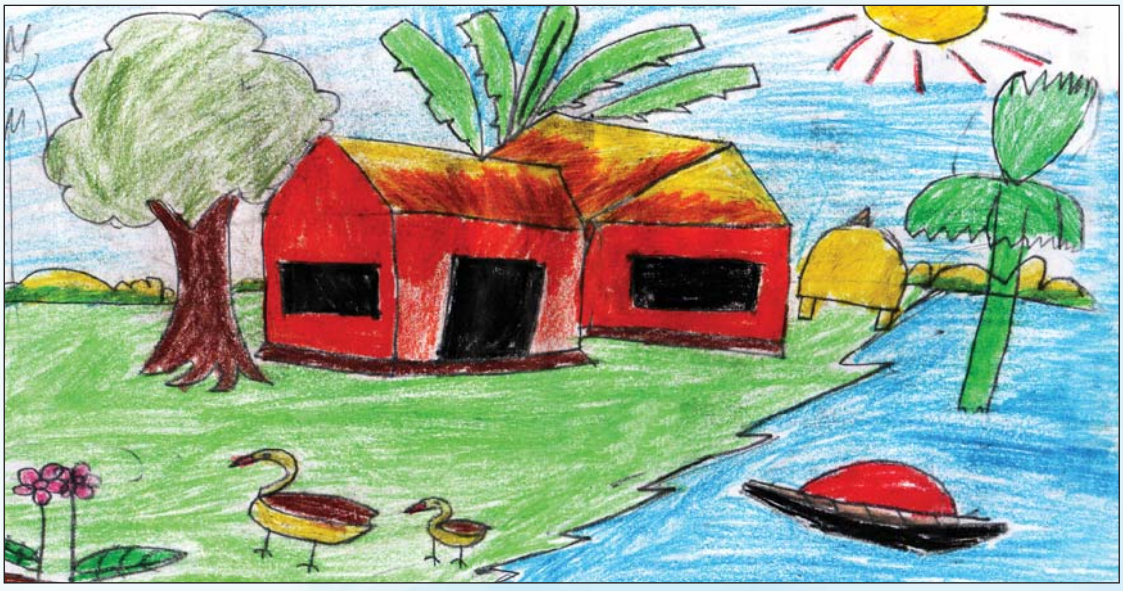

মৃন্ময়ী দে, প্রথম শ্রেণি, নবগঙ্গা ন্যাশনাল একাডেমি, ঝিনাইদহ

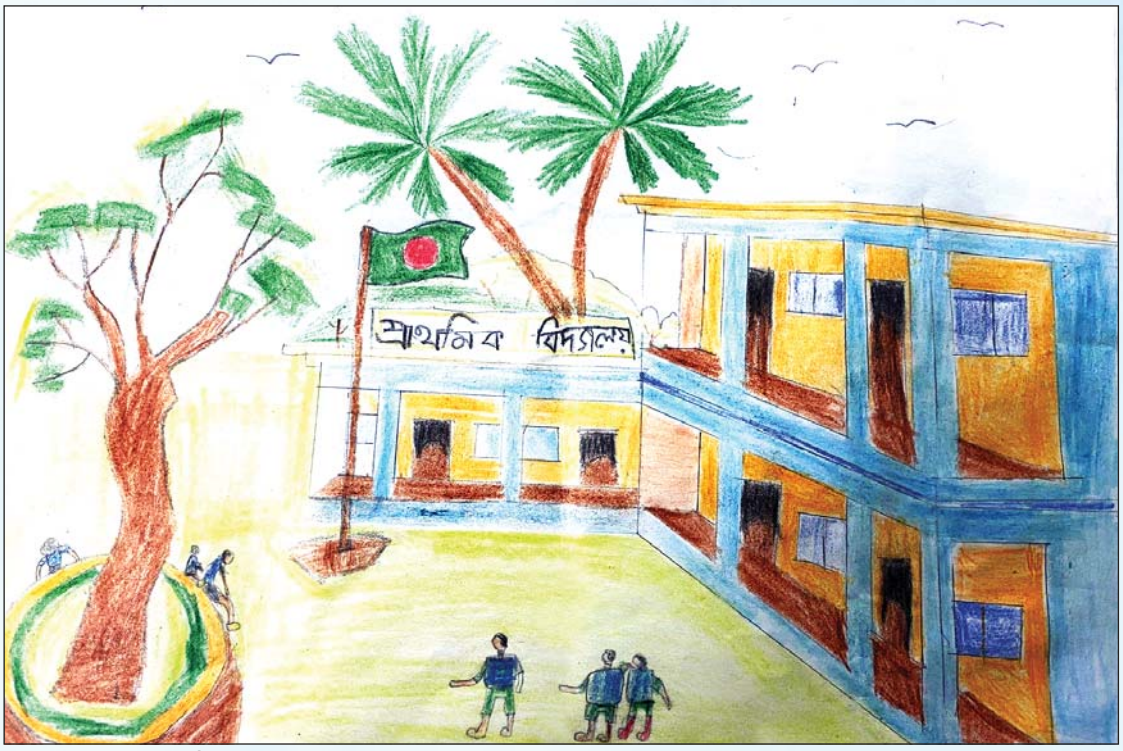

মাহিম সরকার, তৃতীয় শ্রেণি, নাহার ল্যাবরেটরি পাবলিক স্কুল

নাফিসা তাবাসসুম তাজ, নবম শ্রেণি, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

আয়ান হক ভূঁইয়া, চতুর্থ শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

রামিসা রহমান, গালিমপুর রহমানিয়া হাই স্কুল, নবাবগঞ্জ ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-49, No-01. July 2024, Tk-20.00

Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা